মাস্টার জ্যাকারিয়ুস

জুল ভার্ন অমনিবাস

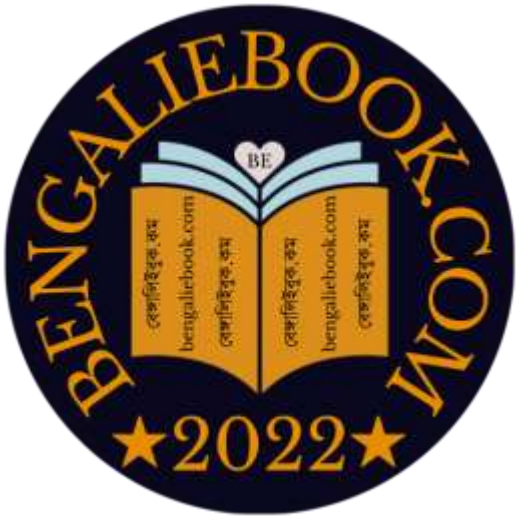

সূচিপত্র

১. হিমরাত্রি 2
২. বিজ্ঞানের দম্ভ 16
৩. অদ্ভুত আগন্তুক 26
৪. সাঁৎ পিয়েরের গির্জে 40
৫. ঘণ্টা বাজলো 52

১. হিমরাত্রি

জেনিভা হ্রদেরই একেবারে পশ্চিম উপান্তে জেনিভা নগরী। হ্রদের থেকে বেরিয়েছে রোন নদী; নগরীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে সে; কিন্তু হঠাৎ নগরীর মাঝখানে সে নিজেই আবার দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে–মাঝনদীতে ছোট্ট একটা দ্বীপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বলে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে অনেক সময়েই এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়। যাতায়াতের যে-সুবিধে এই চঞ্চল স্রোত উপহার দেয়, প্রথম বাসিন্দারা যে তাতেই যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজে থেকেই চলতে থাকে এই রাস্তা, নদীদের পাকল তো এইভাবেই বর্ণনা করেছেন। রোন নদীর বেলায় বলা যায় এ-রাস্তা কেবল চলে না, ছুটে চলে–দৌড়ে চলে।

দ্বীপটা যেন ওই নদীর মধ্যকার মস্ত এক ওলন্দাজ নৌকো। নিয়মিতভাবে নতুন-নতুন বাড়ি-ঘর তৈরি হবার আগে অদ্ভুত ধরনে বাড়ি বানানো হতো এখানে-যেন একটা আরেকটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তো তারা, বিশৃঙ্খল কিন্তু সুন্দর, এলোমলো অথচ মনোরম। নদীর একেবারে পাড় ঘেঁষে উঠছে বাড়ি, মনে হয় যেন নদীর মধ্যেই তার ভিত, যেন থামের গায়ে কোনোরকমে হেলানো আছে–আর চঞ্চল নদীস্রোতের মধ্যে এলোমেলো সেই বাড়িগুলি যেন হঠাৎ কেমন করে আটকে গেছে, না-হলে তারাও হয়তো ভেসে যেতো দূরে। মস্ত-মস্ত সব থামগুলিকে কোনো অতিকায় কাঁকড়ার দাঁড়া বলে মনে হয়–কালো হয়ে গেছে তারা দিনে-দিনে, আর জল তাদের খেয়ে-খেয়ে গেছে–দেখে অদ্ভুত ও অবাস্তব একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। পুরোনো ভিতের মধ্যে ছোট্ট হলুদ জলের স্রোত খেলা করে অন্ধকারে, যেন কোননা, ঊর্ণনাভের সুতো বেরিয়েছে কেঁপে-কেঁপে,

যেন কোনো মস্ত এক-বনের চঞ্চল পাতা তারা–আর জল এই স্তম্ভের অরণ্যে আটকে, বাধা পেয়ে, ধাক্কা খেয়ে, অসীম দুঃখে গর্জে-গর্জে ফেনিয়ে উঠছে।

দ্বীপের বাড়িগুলোর মধ্যে একটি এত পুরোনো ও জীর্ণ যে তাকাবামাত্র প্রথমেই চোখে পড়ে। বুড়ো ঘড়ি-নির্মাতা মাস্টার জাকারিয়ুসের বাড়ি এটা; থাকার মধ্যে আছে তার একমাত্র কন্যা জেরাঁদ; সে ছাড়া ওই বাড়িতে থাকে তার ছাত্র ও সহকারী ওবের তুন, আর পুরোনো দাসী স্কলাস্টিকা।

এই জাকারিয়ুসের সঙ্গে কোনোদিক থেকেই তুলনা চলে এমন কেউ জেনিভায় ছিলো না। কত-যে তার বয়েস, কেউ তা জানেই না। শহরের প্রাচীনতম লোকটি পর্যন্ত এ-কথা বলতে পারবে না কবে থেকে তার কাঁধের উপর লম্বাটে ধরনের তীক্ষ্ণ মাথাটি চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছে কিংবা এটাও কেউ বলতে পারবে না কবে তাকে প্রথম এই শহরের রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেছে–লোকে শুধু এটুকুই জানে যে যখন তিনি পথে বেরোন, হাওয়ায় তাঁর সাদা চুল এলোমেলোভাবে ওড়ে। তিনি যেন আদৌ বেঁচেই নেই : শুধু তাঁর ঘড়িগুলির পেনডুলামের মতো সর্বদাই যেন আন্দোলিত হচ্ছেন। ছোটোখাটো অলবড়ে শরীর তার, সব সময়েই গাঢ় ও গম্ভীর রঙের পোশাক পরেন কালোই বেশির ভাগ সময়। লেয়োনার্দো দা ভিচির ছবির মতো যেন আদ্যোপান্ত কালো রঙেই আঁকা তিনি।

গোটা বাড়িটার মধ্যে যে-ঘরটা সবচেয়ে ভালো আর সুন্দর, সেই ঘরে থাকে জেরাঁদ; ঘুলঘুলির মতো ছোট্ট এক টুকরো জানলা দিয়ে জুরা পর্বতের তুষারঢাকা আশ্চর্য চূড়াটি দেখা যায়। কিন্তু জাকারিয়ুসের শোবার ঘর আর কারখানা যেন জলের গায়ে লাগা গহ্বরের মতো–মেঝেয় পাটাতন ফেলা, তলায় জলের হোত ছলোছলে ঘুরে বেড়ায়।

মনেই পড়ে না কবে থেকে, কিন্তু এটা সত্যি যে খাবার সময় ছাড়া মাস্টার জাকারিয়ুস কখনো তার ঘর থেকে বেরোন না-শুধু মাঝে-মাঝে যখন শহরের বিভিন্ন ঘড়িগুলোকে দম দিতে যেতে হয়, তখন অবশ্য অন্য রকম। সারা সময়ই তিনি তার বেঞ্চির উপর বসে কাটান : আশপাশে ঘড়ির অসংখ্য সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে থাকে–আর এখানে বলা উচিত যে এইসব যন্ত্রের অধিকাংশই তার নিজের আবিষ্কার। আশ্চর্য তার মেধা আর চাতুরী; আলেমান ও ফরাশি দেশে তাঁর কাজের অত্যন্ত সুখ্যাতি। জেনিভার শ্রেষ্ঠ ঘড়িনির্মাতারা অল্প দিনের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠতা বুঝতে পেরেছিলো। তিনি যে নগরীর একজন সম্মান, এটা তারা স্পষ্টভাবে বলেছিলো তখন; ঘড়ির যে-অংশটা গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তা আবিষ্কার করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার। সত্যি বলতে, সত্যিকার ঘড়ির জন্মই হলো তখন, যখন কয়েক বছর আগে জাকারিয়ুসের প্রতিভা নানা সূক্ষ্ম জিনিশ আবিষ্কার করলো।

অনেকক্ষণ ধরে কঠোর ও একটানা কাজ করার পর আস্তে-আস্তে জাকারিয়ুস তার যন্ত্রপাতি সরিয়ে রাখেন; আতশকাঁচ দিয়ে দেখে-দেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রগুলি জুড়ছিলেন তিনি এতক্ষণ–এবার তার লেদ-এর সচল চাকাটা তিনি বন্ধ করে ফ্যালেন; তারপর মেঝের পাটাতনের চোরা দরজাটার পাল্লা তুলে ঝুঁকে দাঁড়ান তিনি; নিচে চোখের তলায় বোন নদীর প্রখর স্রোত আবর্ত তুলে ছুটে যাচ্ছে–ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওইভাবে দাঁড়িয়ে সেই ভিজে ও ঘন বাষ্প নিশ্বাসে টেনে নেন বুকে।

একদিন শীতের রাত্রে স্কলাস্টিকা যথারীতি খাবার-টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলে : বাড়ির রীতি অনুযায়ী তরুণ যন্ত্রশিল্পী ওবের আর সে দুজনেই প্রভুর সঙ্গে খেতে বসে।

জাকারিয়ুসের খাদ্য অত্যন্ত সাবধানে রান্না করা হয় : সে-রাতে কিন্তু সুন্দর নীল রেকাবিতে সাজিয়ে দেয়া খাদ্যবস্তু তিনি স্পর্শই করলেন না। কন্যা জেরদের মিষ্টি কথাগুলির উত্তরে সংক্ষেপে হু-হাঁ করে যাচ্ছিলেন কিংবা কখনো কোনো কথাই বলছিলেন না। জেরাঁদের কথা থেকে বোঝা গেলো যে বাবার এই অদ্ভুত স্তব্ধতা সে স্পষ্ট লক্ষ করেছে। এমনকী স্কলাস্টিকার একঘেয়ে ও অবিরাম বকুনিতে পর্যন্ত তিনি কোনো কান দিলেন না; রোন নদীর অবিশ্রাম কলরোলের সঙ্গে স্কলাস্টিকার মুখরতার যে কোনো তফাৎ তিনি ধরতে পেরেছেন, এটা তার মুখ দেখে মনে হলো না।

চুপচাপ খেয়ে উঠে জাকারিয়ুস কাউকেই শুভরাত্রি না-জানিয়ে তার কুঠুরিতে চলে গেলেন; অন্যদিন খাওয়া-দাওয়ার পর কন্যাকে আলিঙ্গন করে সস্নেহে তার কাপলে চুম্বন করেন তিনিঃ কিন্তু আজ তাও করলেন না, বরং তিনি যখন দরজার বাইরে চলে গেলেন তখন তার ভারি পায়ের তলায় সিঁড়িটা আর্ত গলায় কেবল কারে-কাৎরে উঠলো।

জেরাঁদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা–তিনজনেই স্তব্ধ বসে রইলো কিছুক্ষণ। সন্ধে থেকেই আকাশ মেঘলা হয়ে আছে, কেমন বিমর্ষ আর মলিন; কোনোরকমে নিজেদের টেনে-হিঁচড়ে আল্পসের চুড়া পর্যন্ত যেতে পেরেছে যেন ভারি মেঘগুলি–তারপর অবসন্ন হয়ে সেখানেই বসে আছে, কালো ও গম্ভীর; আর বৃষ্টি হবে, এই কথাই জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভিজে হাওয়া। সুইজারল্যাণ্ডের প্রবল বর্ষণকাল যেন মন খারাপ করিয়ে দেয় কেবল–রাশি ও রাশি বিষাদ যেন ছড়িয়ে দেয় সে চারদিকে। সেই থেকে বাড়ির চারপাশে ভীষণ দখিনা বাতাস গজরাচ্ছে, আর তার তীক্ষ্ণ শিসের মধ্যে যেন ভিড় করে আছে অলুক্ষুণে সব আশঙ্কা।

অবশেষে স্কলাস্টিকাই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙলে। জেরাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে, কর্তা আজ ক-দিন থেকেই যেন কেমন হয়ে আছেন। মাতা মেরির নামে শপথ উচ্চারণ করলে সে। খাদ্যে যে তার কোনো স্পৃহা নেই–তা তো স্পষ্ট। বোধহয় অনেক কথা তার ভিতরে ভিড় করে আছে–অথচ সেগুলি যে কী, তা বের করে আনতে গেলে অতি-ধূর্ত কোনো শয়তানও একেবারে হিমশিম খেয়ে যাবে।

গোপন কোনো উদ্বেগ রয়েছে নিশ্চয়ই। অথচ উদ্বেগের কারণ যে কী তা তো কিছুই বুঝতে পারছি না, গভীর উৎকণ্ঠা ও বিষাদ ফুটে উঠলো জেরাঁদের মুখচোখে।

এত মন খারাপ করবেন না, মাদমোয়াজেল, মাস্টার জাকারিয়ুসের স্বভাব তো জানেনই আপনি। তাঁর মনের মধ্যে যে কী আছে, তা কি কোনোদিনই-কেউ টের পেয়েছে? হয়তো আজ অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করছিলেন, দেখবেন, কাল তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি কষ্ট পেয়েছেন জানলে তখন হয়তো আবার অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়বেন। জেরাদের আশ্চর্য আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বললো ওবের।

ওবের-এর বুদ্ধি বিবেচনা ও সততা জাকারিয়ুসের ভালো লেগেছিলো বলেই তাকেই তিনি প্রথম নিজের হাতে কাজ শেখাতে রাজি হয়েছিলেন–ওবের ছাড়া আর কাউকেই তিনি কখনো তাঁর বিশেষ কর্মপদ্ধতি শেখাতে চাননি। ওবেরের প্রতি এখন জেরার্দ এমনি আসক্ত হয়ে পড়েছে যে তার নিষ্ঠা সম্বন্ধে এখন কোনো প্রশ্নই আর ওঠে না।

জেরাঁদের বয়স আঠারো বছর। গোল ছাঁদের মুখ তারমাদোন্নার মতো সরল আর স্বর্গীয় যেন, যে-স্নিগ্ধা শুচিতা এখনও ব্রিটনিয়ার কোনো-কোনো প্রাচীন রাস্তায়-ঘাটে দৈবাৎ

চোখে পড়ে। চোখ দুটিতে ছড়িয়ে আছে অসীম সরলতা। কোনো কবির স্বপ্ন-মাধুরীর প্রতিমা যেন সে, আর তা-ই তাকে ভালো না-বেসে কোনো উপায় নেই। তার পোশাকের রঙ স্নিগ্ধ ও সুকুমার–তাতে কোনো তীব্র কর্কশ চীৎকার নেই; গির্জের রেশমে যে-স্নিগ্ধতার আভা চোখে পড়ে, তেমনি শুভ্র বসনে তার সুডৌল কাঁধখানি ঢাকা। জেনিভায় তো এখনও কালভিনবাদের শুষ্কতা ছড়িয়ে পড়েনি–আর জেরাঁদ যেন তারই মধ্যে কোনো অতীন্দ্রিয় জগৎ খুঁজে পেয়েছে।

লাতিন স্তোত্র পাঠ করে সে রাত্রে আর সকালে; সম্প্রতি আবার ওবের তুনের মধ্যে গোপন মমতা আবিষ্কার করেছে সে–তার প্রতি এই তরুণ যন্ত্রশিল্পীর অনুরাগের প্রবলতা তার আর অজানা নেই। এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতার বাড়িটাই যেন ওবেরের সমস্ত জগৎ; নিজের কাজ শেষ হয়ে গেলে জাকারিয়ুসের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে সে, বাকি সময়টা এই তরুণীর কাছেই কাটিয়ে দেয়, পারতপক্ষে বাড়ি ছেড়ে এক পা-ও বেরোয় না।

বুড়ি দাসী স্কলাস্টিকা দেখছিলো সবই, কিন্তু কিছুই বলতো না। দিনকাল যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, আর গৃহস্থালির টুকিটাকি যে আসলে মোটেই ফ্যালনা নয়–তার যাবতীয় বকবকানি এতেই নিঃশেষ হয়ে যেতো। একবার সে যদি কোনে বিষয়ে বকবক শুরু করে তো তার আর বিরাম নেই, এই তথ্যটা সবাই জানতো বলেই কেউ তাকে আর থামাবার চেষ্টা করতো না। জেনিভায় যে কলের বাজনা-ওলা নস্যিদানি তৈরি হয়, সে যেন তা-ই। একবার চাবি দিলে, হাতুড়ির বাড়ি মেরে কেউ তাকে ভেঙে না-ফেললে, সমস্ত দম ফুরিয়ে না-ফেলে কিছুতেই সে থামবে না।

জেরাঁদকে অমন স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়তে দেখে স্কলাস্টিকা তার পুরোনো কাঠের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে গেলো; মস্ত একটা রুপোর পিলশুজে মস্ত একটা মোমবাতি জ্বেলে পাথরের কুলুঙ্গির মধ্যে গালার তৈরি মেরিমাতার প্রতিমার পাশে বসিয়ে দিলে। গৃহস্থালির অধিষ্ঠাত্রী এই মাদোন্না মূর্তির কাছে নতজানু হয়ে বসাই ছিলো বাড়ির নিয়ম; তিনি যাতে দয়া করে আসন্ন রাত্রিকালে সবাইকে দ্যাখেন, ঘুমুতে যাবার আগে এই প্রার্থনা করতে হয় তার কাছে। জেরাঁদ কিন্তু আজ চুপ করে তার চেয়ারেই বসে রইলো।

বাঃ, স্কলাস্টিকা অবাক হয়ে গেলো, খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, শুতে যাবার সময়ও হলো- অত রাত অব্দি জেগে থেকে খামকা চোখকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? হায়, মেরি মাতা! এর চেয়ে ঘুমিয়ে থাকা অনেক ভালো–তাহলে অন্তত স্বপ্নে কিছুটা আরাম পাওয়া যাবে। দিনকাল যেমন জঘন্য হয়ে পড়েছে, তাতে সুখশান্তি পাবার কি আর জো আছে আজকাল?

বাবার জন্য ডাক্তার ডাকা উচিত না আমাদের? জিগেস করলো জেরাঁদ।

ডাক্তার! বুড়ী দাসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, ডাক্তার-বদ্যির বড়ো-বড়ো কথাবার্তা আর খেয়ালে কত্তা কি কোনোদিনও কান দিয়েছেন? বরং ঘড়িকে দামি ওষুধ খাওয়াবেন–কিন্তু নিজে? কখনো না!

কী করবো তাহলে? আপন মনেই বললো জেরাঁদ, বিশ্রাম নিচ্ছেন, না কাজ করছেন, কে জানে?

জেরাঁদ, ওবের নরম স্বরে বললে, আপনার বাবা একটু ভাবনায় পড়েছেন, এইমাত্র–আর-কিছুই তাঁর হয়নি।

আপনি জানেন, ওবের, কী সে ভাবনা?

বোধহয় জানি, জেরাঁদ। অন্তত আন্দাজ করতে পারি।

তাহলে বলে ফ্যালো তো চটপট, অত্যন্ত উৎসুকভাবে বলে উঠলো স্কলাস্টিকা। পয়সা বাঁচাবার জন্য মোমবাতিটা সে নিভিয়ে দিলে।

জেরাঁদ, ওবের বললে, দিন কয়েক ধরে অদ্ভুত কতগুলি প্রহেলিকার মতো ব্যাপার ঘটেছে। আপনার বাবা কয়েক বছর ধরে যে-ঘড়িগুলি বানিয়ে বিক্রি করেছিলেন, সব হঠাৎ এক-এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সারাবার জন্য অনেকে ঘড়িগুলি তাঁকে দিয়ে গেছে। অত্যন্ত সাবধানে তিনি ঘড়িগুলি খুলেছেন। স্প্রিং-এ কোনো দোষই নেই, চাকা আর কাঁটাগুলিও ঠিক আছে–তবু আরো সাবধানে ভালো করে দেখেশুনে তিনি আবার জুড়ে দিয়েছেন সেগুলি। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ঘড়িও আর চলছে না।

নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কাণ্ড! স্কলাস্টিকা চেঁচিয়ে উঠলো।

এ-কথা কেন বলছো? জেরাঁদ জিগেস করলে। আমার কাছে তো ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বোধ হচ্ছে। জগতে তো আর চিরকাল কিছুই থাকে না। মানুষ কি আর অসীমকে স্পর্শ করতে পারে?

কিন্তু তবু এটা ঠিক যে, ওবের বললে, ব্যাপারটা কেবল রহস্যময় নয়, অসাধারণও। ঘড়িগুলি হঠাৎ কেন বিকল হয়ে গেলো, আমিও তার সঙ্গে তা তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও কোনো গোলমাল চোখে পড়েনি। হতাশ হয়ে কতবার যে হাল ছেড়ে দিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

তা এমন-একটা অর্থহীন কাজ করারও চেষ্টা কেন, বাপু? স্কলাস্টিকা বললে, ওই তামার কলটা নিজে থেকেই চলবে, সময় বলে দেবে, জানিয়ে দেবে এমনকী ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড–তাকে কি স্বাভাবিক বলে? এর চেয়ে আমাদের ছায়া-ঘড়িই ঢের ভালো ছিলো।

যখন শুনবে যে কেন ওই ছায়া-ঘড়ি বের করেছিলো, ওবের বললে, তখন তুমি আর ও-কথা বলবে না।

হা ঈশ্বর! এ আবার কী কথা শোনালে।

তোমার কি মনে হয়, অত্যন্ত সরলভাবে শুধোলে জেরাঁদ, বাবার ঘড়িগুলি যাতে ঠিকমতো চলে, সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত আমাদের?

নিশ্চয়ই,তৎক্ষণাৎ বললে ওবের।

ভালো, কিন্তু এই প্রার্থনায় কোনো ফল হবে না, স্কলাস্টিকা আপন মনে বিড়বিড় করলে, তবে উদ্দেশ্য ভালো বলে ভগবান এদের ক্ষমা করবেন।

আবার জ্বালানো হলো মোমবাতি। স্কলাস্টিকা, জেরাঁদ আর ওবের মেঝেয় নতজানু হয়ে বসলো একসঙ্গে। জেরাঁদ প্রথমে প্রার্থনা করলো রাত্রির জন্য করুণা ও আশিস, প্রার্থনা করলে বন্দী আর পথিক, ভালো আর মন্দ সকলের জন্য, আর সবশেষে তার বাবার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সবচেয়ে কাতরভাবে মিনতি জানালো সে।

ভগবানের কাছে সব দুঃখ নিবেদন করে দিলো বলে প্রার্থনার পরে যখন তারা তিনজন উঠে দাঁড়ালো, তখন তাদের মনে বেশ খানিকটা আস্থা জেগে উঠেছে।

ওবের তার নিজের ঘরে চলে গেলো; জেরাঁদ একা জানলার পাশে বসে-বসে কী যেন ভাবতে লাগলো, আর আস্তে-আস্তে রাস্তায় শেষ বাতিগুলো নিভে গেলো; স্কলাস্টিকা প্রথমে চুল্লির নিভু নিভু অঙ্গারে একটু জল ছিটিয়ে দিলে, তারপর দরজার মস্ত খিল দুটি লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লো-আর শয়তানের ভয়েই মরে যাচ্ছে বলে সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো পরক্ষণে।

ক্রমেই বাড়তে লাগলো শীতের রাতের বিভীষিকা ও আতঙ্ক। মাঝে-মাঝে নদীর আবর্তের সঙ্গে কঙ্কনে ঝোড়ো হাওয়া এসে মেশে, আর সারা বাড়িটা থরথর করে কেঁপে ওঠে; জেরাঁদ কিন্তু তেমনি ঠায় বসে আছে জানলায়, বিষণ্ণ ও একা–বাবার চিন্তায় মগ্ন ও তন্ময়। ওবেরের কাছ থেকে বিকল ঘড়ির কথা শোনবার পর থেকেই বাবার উদ্বেগ আর অসুখ ক্রমেই অতিকায় আর ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে বলে তার মনে হলো। তার বাবার জীবন যেন কেমন যান্ত্রিক হয়ে গেছে–এবং এ-কথা ভাবতে তার অত্যন্ত কষ্ট হলো বটে, তবু সে অনুভব করলে যে, যে-খুঁটির উপর ভর করে তাঁর জীবন ঘুরে চলতো, তা যেন ক্রমেই জীর্ণ হয়ে পড়ছে–আগের মতো তেমন সহজ ও অনায়াস ভাবটা যেন আর নেই।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার ছাদের চিলেকোঠার জানলার পাল্লাটা প্রচণ্ডভাবে দেয়ালে গিয়ে লাগলো। যেন ভীষণ ঘা খেয়ে জেরাঁদ শিউরে তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, কিন্তু আওয়াজটার উৎস সে ধরতে পারলো না। একটু যখন শিহরন কমলো, ধীরে-ধীরে সে জানলার শার্শি খুলে দিলে। চিরে, ফেটে চুরমার হয়ে গেছে যেন মেঘ, আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে আশপাশের বাড়ির ছাতে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে সে খড়খড়িটা টেনে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে উঠলো, কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব।

মনে হলো বৃষ্টি আর নদীর জলে একাকার হয়ে গেছে চারদিক, যেন প্লাবন শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ, জীর্ণ বাড়িটা বুঝি আস্ত ডুবে যাচ্ছে জলে। নড়বোড়ে কাঠ আর পাটাতন কাতর আর্তনাদ করে উঠছে বারেবারে। ভয় পেয়ে সে তার ঘর ছেড়েই বুঝি পালাতো, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ জাকারিয়ুসের শোবার ঘরে সে আলোর রেশ দেখতে পেলো। কেনো, কোনো সময় আদিম দেবতাদের গর্জন আমাদের কানে পৌঁছোয় না, বরং তার চেয়ে অনেক মৃদু ও অস্ফুট শব্দ জড়ে মধ্যে অতিকায় হয়ে ওঠে। হঠাৎ যেন কোনো অস্ফুট বিলাপের ধ্বনি তার কানে এসে পৌঁছুলো। জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারলো না। ঝোড়ো হাওয়ায় যেন বারেবারে ঠেলে দিচ্ছে তাকে, লুকিয়ে বাড়িতে ঢোকবার সময় চোরকে যেভাবে বাড়ির দরজা-জানলা ঠেলে ফেলে দিতে চায়।

মনে হলো আতঙ্কে সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। এত রাত্রে কী করছেন তার বাবা? দরজা খুললো সে, কিন্তু কবাটটা তার হাত থেকে সরে গেলো। ঝোড়ো হাওয়া তাকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললো দেয়ালে। অন্ধকার খাবার ঘরে এসে দাঁড়ালো জেরাঁদ,

তারপর কোনোরকমে পা টিপে-টিপে অধমূর্ছিত ও বিবর্ণর মতো বাবার কারখানার দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো।

নদীর গর্জনে আর চীকারে আস্ত ঘরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে আর তার মাঝখানে সোজা দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা। কেমন এক জ্যান্ত বিভীষিকার। মতো তাঁর শাদা চুল উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায়; হাত-পা নেড়ে উদ্ভ্রান্তের মতো কথা বলছেন তিনি–যেন তার চোখ-কান নিঃসাড় হয়ে গেছে, কিছুই শুনছেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না। জেরাঁদ স্তব্ধ হয়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

মৃত্যু! ফাঁকা গলায় বলছেন জাকারিয়ুস, জেরাঁদ শুনতে পেলো। মৃত্যু ছাড়া আর-কিছুই না। নিজের অস্তিত্বটাকেই যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছি তখন আর বেঁচে থাকবোই বা কেন? আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস, আমিই তো আমার সব ঘড়িগুলোর স্রষ্টা! রুপো, লোহা আর সোনার ওই সব ঘড়ির মধ্যে আমারই প্রাণ তো আমি টুকরো-টুকরো করে বিলিয়ে দিয়েছি–আমার আত্মাকেই দিয়েছি আমি ওদের। একটা করে ওই অভিশপ্ত ঘড়িগুলো থেমে যায় আর মনে হয় বুকের একটা অংশ ছিঁড়ে গেলো, যেন স্পন্দন থেমে যাবে কারণ আমারই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তো অমি ভরে দিয়েছি ওদের মধ্যে।

অদ্ভুত এই কথাগুলি বলতে-বলতে বৃদ্ধ বারেবারে তার বেঞ্চির দিকে তাকাচ্ছেন। খোলামেলা ঘড়ির টুকরো-টুকরো কলকজা ছড়িয়ে আছে। বেঞ্চিতে, সারাবার জন্য তিনিই খুলেছেন এই ঘড়িগুলি। স্প্রিংজড়ানো একটা ফঁপা নল তিনি তুলে নিলেন হাতে; তারপর শাঁখের পাকের মতো প্যাচানো ইস্পাতের ইস্কুপ খুললেন তিনি; স্থিতিস্থাপকতার নিয়ম অনুযায়ী স্পিংটা ছড়িয়ে পড়লো না, বরং কোনো ঘুমন্ত গোখরোর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে

পড়ে হইলো স্তব্ধ ও নিঃসাড়; গ্রন্থিল মনে হলো এই স্প্রিংকে, মৃত ও শৃঙ্খলিত যেন–যেন কোনো অক্ষম ও অসক্ত বৃদ্ধ যার রক্ত অনেক দিন আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। রোগা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে জাকারিয়ুস মিথ্যেই স্প্রিংটাকে ছাড়াতে চাইলেন আর দেয়ালে তাঁর এই ব্যর্থ ধস্তাধস্তির ছায়া অতিকায় হয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু ব্যর্থ, ব্যর্থ সব চেষ্টা। রোষে আর যন্ত্রণায় হঠাৎ তীব্র চীৎকার করে উঠে তিনি ক্ষুধিত ও টগবগে রোন নদীর বুকে স্পিংটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জেরাঁদের পা দুটি যেন মেঝেয় হঠাৎ আটকে গেছে–নিশ্চল সে দাঁড়িয়ে রইলো রুদ্ধশ্বাসে। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলো সে, কিন্তু পারলো না। মাথা ঘুরছে তার, অতিকায় সব দুঃস্বপ্ন যেন হানা দিচ্ছে তার মাথায়। হঠাৎ যেন। ছায়ার মধ্যে থেকে কে তার তার কানে ফিশফিশ করে বলে উঠলো, জেরাঁদ! তুমি! এখনো জেগে আছো? তোমার ঘরে যাও, লক্ষ্মীটি। কনে ঠাণ্ডা পড়ছে আজ।

ওবের! জেরাঁদ ফিশফিশ করে উঠলো, তুমি!

তোমার কষ্ট কি আমাকেও কষ্ট দেয় না?

হঠাৎ এই মৃদু কথাগুলি যেন জেরাঁদের বুকে রক্ত ফিরিয়ে দিলো। ওবেরের কাঁধে ভর দিয়ে সে বললে, বাবার নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো অসুখ করেছে, ওবের। কেবল তুমিই তাকে সারাতে পারো, কারণ মেয়ের সান্ত্বনায় তার এই মানসিক বিশৃঙ্খলা মোটেই কমবে না। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লোকের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র হয়ে পড়েছেন তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে-করতে, নষ্ট ঘড়িগুলি সারাতে-সারাতে, তুমিই শুধু তার চেতনা

ফিরিতে আনতে পারো। ওবের, নিশ্চয়ই তার কথা সত্যি নয়? নিশ্চয়ই ওই ঘড়িগুলির মধ্যে নিজের প্রাণ তিনি পুরে দেননি?

ওবের কোনো কথা বললে না।

বাবার কাজ কি তবে ভগবানের চোখে দোষী? জেরাঁদ ভয়ে কেঁপে উঠলো। বললো ওবের, জানি না। কিন্তু তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমুলে পরে আসা ফিরে পাবে।

আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এলো জেরাঁদ, সকাল পর্যন্ত সেখানেই সে বসে রইলো একা ও অতন্দ্র, একবারও চোখের পাতা বুজলো না তার। আর মাস্টার জাকারিয়ুস সারাক্ষণ নিশ্চল ও স্তব্ধভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কেমন করে তার পায়ের তলায় চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট রোন নদী অবিশ্রাম বেগে দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

২. বিজ্ঞানের দম্ভ

ব্যাবসার বিষয়ে জেনিভার বণিকদের কঠোরতা প্রায় প্রবাদবচনে পরিণত হয়েছে। বিপুল তাদের সম্মানবোধ, অতিরিক্ত তাদের সততা, আর মর্যাদার বিষয়ে তারা অত্যন্ত কঠোর। ফলে বিপুল ধৈর্য ও যত্ন সহকারে যে-ঘড়িগুলি বানিয়েছিলেন, সবখান থেকেই সেগুলো যখন ফিরে আসতে লাগলো, তখন লজ্জা ও ধিক্কারে মাস্টার জাকারিয়ুস যে কী পরিমাণ সংকুচিত হয়ে পড়লেন, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

ঘড়িগুলো যে অকারণেই আচমকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অকারণে, কেননা ঘড়ির ভিতরকার চাকা ভালোই আছে, কোথাও ঢিলে বা আলগা হয়ে যায়নি, কাঁটাগুলোও ঠিক আছে; কিন্তু স্প্রিংয়ের স্থিতিস্থাপকতা আর একটুও নেই। দুজ্ঞেয় এই বিফলতা তাঁর মান ও মর্যাদাকে গভীরভাবে ক্ষুণ্ণ ও আহত করলো। আশ্চর্য-সব আবিষ্কারের জন্য বহুবারই লোকে তাঁকে কালেগা জাদু বা ডাকিনী তন্ত্রের উপাসক বলে সন্দেহ করেছে–এবার সেই সন্দেহ যেন প্রমাণিত হয়ে গেলো। আর এইসব গুজব ও জনরব শেষকালে জেরাদেরও কানে পৌঁছুলো; ভয়ে সে প্রায়ই তার বাবার কথা ভেবে শিউরে ওঠে–বিশেষ করে যখন দ্যাখে যে লোকে দারুণ ক্রতাভরা চোখে তাকে তির্যকভাবে নিরীক্ষণ করছে, তখন তার বুকের রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

তবু এই তীব্র মনস্তাপের রাত্রিটি কেটে গিয়ে যখন সকাল হলো, মাস্টার জাকারিয়ুস কিঞ্চিৎ আস্থার সঙ্গে পুনর্বার তার কাজে মন দিলেন। সকাল বেলার সূর্য যেন তাকে

নতুন সাহস ও প্রেরণা দিলে। ওবের তাড়াতাড়ি গিয়ে কারখানাঘরে ঢুকলো; জাকারিয়ুস অত্যন্ত শিষ্ট ও অমায়িকভাবে তাকে সুপ্রভাত জানালেন।

আগের চেয়ে বেশ ভালো বোধ করছি, বৃদ্ধ বললেন, কাল যে কী একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিলো মাথার মধ্যে কে জানে। কিন্তু সকালের আলোেই যেন রাতের মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও দূর করে দিয়েছে।

সত্যি-বলতে, ওবের বললে, আমাদের দুজনের কারু পক্ষেই রাতটা ঠিক সহ্য হয় না।

তুমি ঠিকই বলেছো, ওবের। কোনোদিন যদি বড়ো হয়ে ওঠো তো বুঝতে পারবে যে, দিন যেন তোমার কাছে খাদ্যের মতো জরুরি। যাঁরা জ্ঞানীগুণী ও মস্ত মানুষ, তাঁদের সবসময়েই সহযোগীদের প্রশংসা ও প্রশস্তির জন্য তৈরি থাকতে হয়।

মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় আপনাকে বুঝি বিজ্ঞানের দম্ভ পেয়ে বসেছে।

দম্ভ, ওবের! দম্ভ? অতীত ধ্বংস করে ফ্যালো আমার, কেড়ে নাও আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎকে একেবারে টুকরো-টুকরো করে ফ্যালো-আর একমাত্র তবেই আমি লোকচক্ষুর আড়ালে ও অজ্ঞাতসারে বাঁচতে পারবো। বেচারা, আমার এই শিল্প যে কোন মহান অসীমকে স্পর্শ করেছে, তা কি তুমি বুঝতে পারো না? এমনকী তুমিও কি আমারই হাতের নিছক একটা যন্ত্র মাত্র নও?

তবু, ওবের অত্যন্ত বিনীতভাবে তার গুরুদেবকে বললে, আপনিই তো আমাকে আপনার ঘড়ির অতি সূক্ষ্ম কলকজাগুলি জুড়ে দেবার জন্য একাধিকবার প্রশংসা করেছেন। আমি কি তার যোগ্য নই?

সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, ওবের। তুমি একজন ভালো কারিগর, এটা সত্যি, আর এই জন্যই তোমাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু কাজ করার সময় তুমি তো এটাই ভাবো যে তোমার হাতে বুঝি সোনা, রুপোবা তামাই রয়েছে কয়েক টুকরো। তুমি তো এটা কল্পনাও করতে পারো না যে এই ধাতুগুলো আমার মনীষা ও মেধার কাছ থেকে প্রাণ পেয়ে রক্তমাংসের জীবের মতো স্পন্দিত হয়ে ওঠে। ফলে তোমার তৈরি-করা কোনোকিছু বিকল হয়ে গেলে তো আর তুমি মরে যাবে না–কিন্তু আমি যাবো।

কথাগুলি বলেই জাকারিয়ুস কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, কিন্তু ওবের তবু কথাবার্তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

সত্যি?" সে বললে, আপনার কাজ অফুরানভাবে দেখেও আমার আশ মেটে না। পরিষদের উৎসবের জন্য আপনাকে কিন্তু তৈরি থাকতে হবে–কারণ আমি জানি কেলাস-ঘড়ি নিয়ে আপনি যে-গবেষণা করেছেন, তা অমর হয়ে থাকবে।

সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ নেই, ওবের, বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি যে কেলাসকে কেটে হিরের মতো স্থায়িত্ব ও আকার দিতে পারি, এটা মোটেই কম সম্মানের বিষয় নয়। আহ হিরে-কাটার বিদ্যেকে নিখুঁত করে লুই বেরজেম মহদুপকার করে গেছেন আমাদের সেই জন্যেই তো আমি সবচেয়ে কঠিন পাথরকেও

ঘষে-মেজে এমন মসৃণ আর চকচকে করে তুলতে পেরেছি, তার জন্যে তাতে ছিদ্র করা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে।

কেলাস কেটে তৈরি-করা কতকগুলি সূক্ষ্ম কলকজা তুলে দেখালেন। জাকারিয়ুস–প্রতিটি কাজই তার দক্ষতার চরম পরাকাষ্ঠার নজির। ঘড়ির চাক, কীলক, আধার–সবকিছুই কেলাস কেটে বানিয়েছেন তিনি, আর এই অতি কঠিন কাজেই তার অসীম দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

জাকারিয়ুসের মুখ আরক্তিম হয়ে উঠলো। এই স্বচ্ছ আধারের ভিতরে ঘড়িটা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি শোনা যাচ্ছে–এটা কি আশ্চর্য লাগে না তোমার?

বছরে এই ঘড়ির যে এক সেকেণ্ডও এদিক-ওদিক হবে না, তরুণ শিক্ষানবিশটি বললে, তা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।

তুমি যে বাজি জিতবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার নিজের মধ্যে যা-কিছু শুদ্ধ ও নিষ্পাপ, সব কি আমি এতে ভরে দিইনি? আর আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি কখনো এদিক-ওদিক হয়? বলল, আমার হৃৎপিণ্ডের ধকধক কি কখনো হঠাৎ থেমে যায়?

গুরুর দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস পেলো না ওবের।

সত্যি করে বলো আমাকে, জাকারিয়ুসের গলা বিষণ্ণ হয়ে এলো, আমাকে কি তোমার কখনো পাগল বলে মনে হয়নি? আমাকে কি কখনো ভয়ংকর নির্বোধ বলে মনে হয়নি তোমার? বলো, মনে হয়নি কি? কন্যা জেরাঁদ আর তোমার চোখে মাঝেমাঝে আমি যেন

চিরদণ্ডের ছাপ দেখতে পাই। ওহ! আর্ত ও ব্যথাতুর হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর, জগতে যাদের সবচেয়ে ভালোবাসা যায়, তারা যদি কখনো ভুল বোঝে তো তার চেয়ে কষ্টের আর-কিছু নেই। কিন্তু, ওবের, আমি তোমাকে আজ বলছি যে আমি কোনো ভুল করিনি, এটা একদিন অত্যন্ত সফলভাবে প্রমাণ করে দেবো! না, না, মাথা নেড়ো না, তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে তখন। আমার কথায় গভীর অর্থ যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিন আমাকেও তুমি সত্যি-সত্যি বুঝতে পারবে। সেদিন দেখবে যে আমি অস্তিত্বের মূল রহস্য বের করে ফেলেছি। সেদিন দেখবে যে প্রাণ কাকে বলে, তা আমি জেনে ফেলেছি, জেনে ফেলেছি কোন জটিল রহস্যের মধ্যে দেহ আর আত্মার অভেদ মিলন রচনা হয়ে যায়।

এ-কথা বলতে-বলতে গর্বে ও অহমিকায় জাকারিয়ুস যেন রাজার মতো উন্নত হয়ে উঠলেন। কোনো-এক অতিপ্রাকৃত আগুন জ্বলে উঠলো যেন তার চোখে, তার সর্বাঙ্গ দম্ভে দীপ্ত হয়ে উঠলো। আর, সত্যি, যে দম্ভকে ক্ষমা করা যায়, জাকারিয়ুসের এই দম্ভ বোধহয় তাই।

কারণ তার শৈশবে ঘড়িনির্মাণবিদ্যা যেন আঁতুড় ঘরে ছিল। খ্রিষ্টযুগের চার শতাব্দী আগে প্লাতো বের করেছিলেন রাতের ঘড়ি, এই বিদ্যা তদবধি যেন প্রায় স্থবির হয়ে ছিলো। বাঁশির সুরে রাতের প্রহর ঘোষণা করতো, প্লাতোর তৈরি-করা এই ঘড়ি ছিলো অনেকটা ক্লেপসিড্রার মতো। ওস্তাদ কারিগরেরা তার যান্ত্রিক দিকের চেয়ে শিল্পিতার দিকে বেশি নজর দিতেন, ফলে সে-যুগে যেন কে কত সুন্দর ঘড়ি বানাতে পারে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো লোহায়, তামায়, কাঠে বা রুপোয় কারুকাজ করা হতো এইসব ঘড়ি-চেল্লিনির কলসের মতো সুন্দর শিল্পকর্ম যেন। উৎকরণ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রচিত হয়েছিলো এ-যুগে : সময় যদিও ঠিকমতো দিতো না, তবু তারা যে কতটা উৎকৃষ্ট ছিলো,

সেটা মোটেই অবহেলা অমান্য করার মতো নয়। শিল্পীর কল্পনা কলকজার চেয়েও বেশি নিবদ্ধ ছিলো বহির্বিভাগে : আধার ও আবরণ কত সুন্দর করা যেতে পারে, দৃষ্টি ছিলো সেই দিকে, সচল পুতুলে আর গানের সুরে ঘড়িগুলি যেন দামি খেলনা হয়ে উঠেছিলো। তাছাড়া, সেই সুদূর অতীতে কে-ই বা সময়ের নিখুঁত পরিমাপ নিয়ে মাথা ঘামাতো? ঘড়ি কেন হঠাৎ আস্তে চলতে শুরু করে, তার কারণ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি; জ্যোতির্বিদ্যার অনুগণনা তখনও নিক্তিমাপা সংহিতার বশবর্তী হয়ে ওঠেনি, পদার্থবিদ্যায় নির্ভুল গণনার ভিত্তি রচিত হয়নি তখনও; নির্দিষ্ট সময়ে দোকান-পশার ভোলা বা বন্ধ করার তাগিদ ছিলো না তখন; ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় তখন ট্রেন ছাড়তে না। সন্ধেবেলায় ঝমঝম করে ঘন্টা বেজে উঠতো তখন–আর বিশ্বজোড়া স্তব্ধতার মধ্যে প্রহর ঘোষণা করা হতো চীৎকার করে। যদি কাজের পরিমাণের উপর পরমায়ুর পরিমাপ নির্ভয় করে, তাহলে বলতে হয়–লোকে তখন এত দীর্ঘজীবী ছিলো না–কিন্তু তারা আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকতে জানতো। এই বিশ্বসৃষ্টির পরম রহস্য ধ্যান করে হৃদয় তখন সমৃদ্ধ হতো। দুশো বছর লাগতো তাদের একটি গির্জে বা মঠ বানাতে; কোনো শিল্পী সারা জীবনে কেবল গোটাকয়েক ছবি আঁকতেন; কবি লিখতেন একটি মাত্র মহাকাব্য : কিন্তু তবু উত্তরকাল সেই সরল অতীতের কাছ থেকে কত আশ্চর্য রচনা পেলো।

অবশেষে যখন যথাযথ ও নির্ভুল বিজ্ঞানের অগ্রগিত শুরু হলো, ঘড়িনির্মাণবিদ্যাও ক্রমশ উন্নতিলাভ করতে লাগলো। কিন্তু তবু সেই দুরতিক্রম্য বাধ্য থেকে গেলো বিরাট প্রাচীরের মতো : সময়ের অবিরাম ও নিয়মিত

পরিমাপ নেয়া তখনও সাধ্যাতিরিক্তই থেকে গেলো।

এই বন্ধ্যা ভূমিতেই জাকারিয়ুস ঘড়ির এমন-একটি গতি-নিয়ন্ত্রক আবিষ্কার করেছিলেন, দোলকের অন্তর্লীন বলের উপর নির্ভর করতে বলে ঘড়িকে যা এক গাণিতিক অবিচ্যুতি দিয়েছিলো। এই আবিষ্কারই জাকারিয়ুসের সর্বনাশ করলো : তার মাথা ঘুরে গেলো। তাপমান যন্ত্রে যেমন পারদ ফুলে ওঠে, তেমনি তার বুকে স্ফীত হয়ে উঠলো অমেয় দম্ভ–একেবারে যেন শেষ সীমায় পৌঁছুলো পারদ, এবার চন্দ্র ফেটে বেরিয়ে আসবে। উপমার সাহায্যে নিজেকে তিনি অচিৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে দিয়েছেন : আর তাই ঘড়ি বানাতে-বানাতে একদিন তার মনে হয়ে গেলো তিনি বুঝি দেহ ও আত্মার মিলনের মূল রহস্যটি ভেদ করেছেন।

কাজেই ওবেরকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে দেখে অতি সহজেই তিনি তার নিজের ধ্যান-ধারণা খুলে বললেন : তুমি জানো প্রাণ কাকে বলে? যে-সব স্প্রিং-এর জন্যে জীব বেঁচে থাকে তাদের রহস্য তুমি কখনো ভেবে দেখেছো? নিজেকে পরীক্ষা করে দেখেছে কোনোদিন? না। অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে তুমি সহজেই আমার কাজ আর ভগবানের কাজের মাঝখানে গভীর মিল খুঁজে পেতে; কারণ তাঁর প্রাণীদের দেখেই ঘড়ির চাকা বানাবার কৌশল শিখেছি আমি।

উৎসুকভাবে ওবের বলে উঠলো, ভগবানের নিশ্বাসকেই তো আত্মা বলি আমরা–হাওয়া যেমন করে ফুলকে কাঁপিয়ে যায় তার নিশ্বাসও তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দেয়–আর তার সঙ্গে কিনা আপনি কতগুলো লোহা আর তামার কলকজার তুলনা করছেন? প্রাণের চেয়ে রহস্যময় অথচ নির্ভুল ও প্রেরণাদীপ্ত কোন যন্ত্রবিদ্যা?

প্রশ্ন সেটা নয়, অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন বটে জাকারিয়ুস, কিন্তু তার কথার মধ্যে খাদের-দিকে-এগিয়ে-যাওয়া অন্ধের প্রবল জেদ ফুটে উঠলো। আমাকে বুঝতে হলে আমার আবিষ্কার-করা সেই সময়-নিয়ন্ত্রক দোলকটির উদ্দেশ্য ও অর্থ মনে রাখতে হবে। যে-সব ঘড়ি ঠিকমতো চলে না, তাদের দেখেই এটা আমি বুঝতে পারি যে যে-গতি তাদের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে তা ঠিক যথেষ্ট নয়–কোনো স্বাধীন বলের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন না-করলে সেই গতি কোনো কাজেই লাগবে না। সমতা রাখার জন্যে কোনো চাকা যদি। থাকে তাহলেই হয়তো এটা সম্ভব হবে–একদিন আমার মনে হলো, এবং অবশেষে ওই গতিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলুম, আবার স্বপ্ন সফল হলো। আমার এই চিন্তাটাকে মহান ঠেকে না তোমার? ঐশ্বরিক বলে মনে হয় না কি আমার এই চিন্তাকে, যার বলে আমি বলেছিলুম যে কোনোরকমে ঘড়ির মধ্যেই যদি সেই হারিয়ে-যাওয়া গতিকে ফিরিয়ে আনা যায় তাহলেই সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো ওবের।

ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস। ওবের, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। তুমি কি বুঝতে পারছে না যে আমাদের মধ্যে যুগপৎ দুটি শক্তি কাজ করে যাচ্ছে–দেহের শক্তি, আর আত্মার–গতি আর তার নিয়ন্ত্রণ। আত্মাই প্রাণের মূল–অর্থাৎ আত্মাই হলো গতি, আন্দোলনের উৎস, আলোড়নের আকর। কী থেকে তার সৃষ্টি হয়? কোনোভাব থাকে? না কি। কোনো স্প্রিং বা কোনো নির্জড় প্রভাব থেকে? তা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হৃৎপিণ্ড হলো সেই জিনিশ। কিন্তু দেহ না-থাকলে এই আন্দোলন অসমান হয়ে পড়তো, হয়ে পড়তো অনিয়মিত ও অসম্ভব। কাজেই দেহই এই আত্মাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে–দেহই হলো সমতা রক্ষার সেই চাকা, আত্মা যার নিয়মিত দোলনের

কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর এটা যে কত সত্যি, তার প্রমাণই তো এইখানে যে, খাদ্য পানীয় বা নিদ্রা না-হলে–অর্থাৎ দেহের ক্রিয়া নিয়মিত সংঘটিত না-হলে–মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দোলনের ফলে যে-গতিটুকু হারিয়ে যায় তা ঠিক যেমনভাবে আবার দেহকে জুগিয়ে দেয় আত্মা, আমার ঘড়িতে আশ্চর্য এই গতিনিয়ন্ত্রকটি তা-ই করে। আর কীসের মধ্যে তাহলে দেহ ও মনের মিলনের রহস্য লুকিয়ে আছে? একটি চাকা ঘুরে চলে বলেই অন্য চাকাটি চলতে পারে। এটাই আমার আবিষ্কার, আর আমি তা হাতে-কলমে খাঁটিয়েছি আমার কাজের মধ্যে। প্রাণের আর-কোনো রহস্যই। অজানা নেই আমার প্রাণ যে আসলে আশ্চর্য নিখুঁত একটি কল, তা আমি জেনে গেছি।

মতিভ্রম, সন্দেহ নেই; কিন্তু তবু জাকারিয়ুস যেন সম্ভ্রম জাগান, কেননা এই বিভ্রমই তাকে অসীমের চরম রহস্যের মধ্যে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার কন্যা জেরাঁদ চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনতে পেলো। ছুটে এসে সে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো–আর তার দেহটি যেন কান্নার তোড়ে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।

তোর আবার কী হলো? কন্যাকে জিগেস করলেন জাকারিয়ুস।

এখানে যদি কেবল একটা স্প্রিং থাকতো, বুকে হাত চেপে সে বললে, তাহলে কি তোমাকে এত ভালোবাসতে পারতুম, বাবা?

নিবিষ্টভাবে জেরাঁদকে নিরীক্ষণ করলেন জাকারিয়ুস, কোনো জবাব দিলেন না। তারপরেই হঠাৎ বুকে হাত চেপে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, আর মুছিত হয়ে তার পুরোনো চেয়ারটিতে পড়ে গেলেন।

কী হলো তোমার, বাবা?

শিগগিরি! ওবের চীৎকার করে ডাকলো, স্কলাস্টিকা!

স্কলাস্টিকা কিন্তু তক্ষুনি এলো না। সদর দরজার কে যেন কড়া নাড়ছিলো তখন–সে গিয়েছিলো দরজা খুলে দেখতে। সে যখন কারখানা-ঘরে এসে ঢুকলো, বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ততক্ষণে চেতনা ফিরে পেয়েছেন। তাকে ঢুকতে দেখে সে কোনো কথা বলার আগেই জাকারিয়ুস বললেন, নিশ্চয়ই তুমি আরেকটা নষ্ট ঘড়ি নিয়ে এসেছো? স্কলাস্টিকা, অভিশপ্ত ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে . গেছে, তাই না?

কী আশ্চর্য। আপনি তা জানলেন কী করে? ওবেরের হাতে স্কলাস্টিকা একটি বিকল ঘড়ি তুলে দিলে।

আমার হৃৎপিণ্ড কখনো ভুল করো না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জাকারিয়ুস।

অত্যন্ত যত্নসহকারে চাবি ঘুরিয়ে দম দিলো ওবের–কিন্তু তবু সে-ঘড়ি কিছুতেই আর চলবে না।

৩. অদ্ভুত আগন্তুক

বেচারি জেরাঁদ-যদি-না ওবেরের কথা তার মনে জেগে থাকতো-হয়তো পিতার সঙ্গেই তার প্রাণ হারাতে; ওবেরই এখন তার বেঁচে-থাকার একমাত্র আকর্ষণ।

বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা, ধীরে-ধীরে, নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। যতই তিনি কেবল একটি বিষয়েই মনঃসংযোগ করছেন, ততই তার ক্ষমতা যেন আরো দুর্বল হয়ে আসছে। স্মৃতির বিষণ্ণ অনুষঙ্গ-বশত সবকিছুই কেমন করে যেন তার অদ্ভুত বাতিকটির সঙ্গে জড়িয়ে যায়; মনে হয় ক্রমেই যেন মানবিক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছেন তিনি, আর তার বদলে যেন কোনো পরাবাস্তব শক্তি জেগে উঠেছে তার মধ্যে, যেন কোনো অতিপ্রাকৃত জগতে বেঁচে আছেন তিনি এখন। উপরন্তু, কয়েকজন অসূয়াপরায়ণ ও মৎসর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টায় তার পরিশ্রম ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আবার সেই পুরোনো জনরবটা জেগে উঠলো।

তাঁর ঘড়িগুলি হঠাৎ একযোগে বিকল হয়ে যাচ্ছে, এই খবর জেনিভার সেরা কারিগরদের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ঘড়ির চাকাগুলো হঠাৎ এ-রকমভাবে অসাড় হয়ে যাচ্ছে কেন? বৃদ্ধ জাকারিয়ুসের প্রাণের সঙ্গে তাদের যেন গভীর এক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধটা আসলে কী? এগুলো এমন-সব রহস্য যে এ-সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলেই কেমন একটা গোপন আতঙ্কে সর্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে। শহরের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে–তা সে তরুণ শিক্ষার্থী বা প্রাচীন ঘড়িনির্মাতাদের ঘড়ি-ব্যবহারকারী কোনো মস্ত ভূস্বামী, যেই হোন না কেন–সকলেই এই অদ্ভুত ও অসাধারণ তথ্যটি লক্ষ না-করে পারলো না। মাস্টার জাকারিয়ুসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জেগে উঠলো চারদিকে–কিন্তু

লোকের এই আশা সফল হলো না। ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন জাকারিয়ুস; আর সেই জন্যেই রোজ এই যে অবাঞ্ছিত লোকেরা অবিশ্রান্ত এসে শাসায়, তিরস্কার করে, ভয় দেখায়, তাদের হাত থেকে বাবাকে রক্ষা করতে পারলো জেরাঁদ।

এই জৈব অপলাপ ও ক্ষয়ের বিরুদ্ধে চিকিৎসক আর ওষুধপত্র সমানভাবে অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়লো। এই ক্ষয়ের কোনো কারণই কেউ বের করতে পারলো না; মাঝে-মাঝে মনে হয় এই বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড যেন আর ধুকধুক্ করে না হঠাৎ-হঠাৎ তা যেন বন্ধ হয়ে যেতে চায়; আর তারপরেই আবার এক বিষম ও ভয়ংকর বেগে সেই নিশ্চল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনা জনসমক্ষে প্রদর্শন করার রীতি ছিলো তখনকার দিনে। কাজের নতুনত্ব বা নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে চাইতেন; জাকারিয়ুসের এই অবস্থা কেবল তাদের মধ্যেই উজ্জীবন্ত সমবেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক করলো–কেননা তার সম্বন্ধে তারাই সবচেয়ে উৎসুক ও আগ্রহী ছিলেন। এবার আর তাকে কোনো ভয় নেই বলেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের এত অনুকম্পা। এই বৃদ্ধের সাফল্য ও বিজয়ের কাহিনী তারা কোনোদিনই ভোলেননি। তারা কি জানেন না যখন তিনি তার চমৎকার ঘড়িগুলি প্রদর্শনীতে পাঠাতেন, তখন সচলমূর্তিবসানো, গানের মতো বেজে-ওঠা সেই ঘড়িগুলি লোকের মধ্যে কী পরিমাণ সম্ভ্রম, ভালোবাসা ও প্রশংসার উদ্রেক করত? ফরাশি দেশ, আলেমান ভূখণ্ড, সুইজারলাণ্ড–সর্বত্রই কী চড়া দামে বিকোতো সেই ঘড়িগুলি, তা কি তারা কোনোদিনও ভুলতে পারবেন?

এদিকে জেরাঁদ আর ওবেরের অবিরাম মমতা ও সেবায় জাকারিয়ুসের হৃত শক্তি একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগলো। তাঁর এই রোগ ও বিক্ষোভ তাকে অনেকটা শান্ত করে তুলেছে; যে-চিন্তা এতকাল তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসেছিল, এখন তা থেকে নিজেকে তিনি সরিয়ে আনতে পারেন। হাঁটার ক্ষমতা যেই ফিরে পেলেন, অমনি তাঁর কন্যা তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এলো–কেননা এখনো বিরক্ত ও অতৃপ্ত ক্রেতাদের আক্রমণে বাড়িটা সবসময় ভরে থাকে। ওবের অবশ্য কারখানায় বসে মনোযোগর সঙ্গে সেই বিদ্রোহী ঘড়িগুলোকে বশ মানবার চেষ্টা করে সারাক্ষণ, নানাভাবে সে কলকজাগুলি জুড়ে দ্যাখে যদি কোথাও কোনো টিকটিক শব্দ জেগে ওঠে–কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হয়, মিথ্যেই সে এত পরিশ্রম করে এদের নিয়ে। ফলে শেষটায় বেচারি সম্পূর্ণ হতাশ ও স্তম্ভিত হয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে, তবে মনে হয় সেও বুঝি জাকারিয়ুসের মতো পাগল হয়ে যাবে।

শহরের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলগুলিতে বাবাকে নিয়ে বেড়ায় জেরাঁদ। কখনো সে তার হাত ধরে-ধরে সাঁৎ-আঁতোয়ানের মাঠের পাশ দিয়ে নিয়ে যায়, অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় এখান থেকে–হ্রদের গায়ে যেখানে কোলন পাহাড় উঠছে, একেবারেই সেই পর্যন্ত। সকালটি যেদিন জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেয়, ব্যয়ে পাহাড়ের চুড়ো জেগে ওঠে দিগন্তে। আঙুল তুলে-তুলে বাবাকে সব দেখায় জেরাঁদ–তাদের নামগুলো পর্যন্ত জাকারিয়ুস ভুলে গেছেন। তার স্মৃতির ভিতরে যেন একের পর এক পরদা সরে যায়, নতুন করে সব নামগুলি জেনে নিতে কেমন একটা ছেলেমানুষি আমোদ ও আনন্দ পান তিনি। মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাকান দিগন্তের দিকে, আর একই সূর্যের আলো এসে পড়ে দুজনের মাথায়–একটি মাথায় এলোমেলো ওড়ে শুভ্র চুল আর অন্যটি সোনালি চুলের গুচ্ছে ভরা।

অবশেষে ধীরে-ধীরে সেই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা বুঝলেন যে মোটেই একা নন তিনি জগতে। মাঝে-মাঝে তার এই তরুণী ও রূপসী কন্যার দিকে তাকান তিনি, তারপর নিজের ভেঙে পড়া জীর্ণ দেহটির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েটি একেবারে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়বে। জেনিভার তরুণ ঘড়িনির্মাতাদের মধ্যে অনেকেই জেরাঁদের প্রণয়-প্রার্থনা করেছিলো। কিন্তু জাকারিয়ুসের এই দুর্ভেদ্য গৃহে কেউই প্রবেশাধিকার পায়নি। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই, জাকারিয়ুসের উন্মত্ততায় যখন এই সাময়িক বিরতি নেমে এলো, তখন তিনি ওবের তুনকেই পাত্র নির্বাচন করলেন। একবার যেই এই চিন্তাটার উদয় হলো, অমনি হঠাৎ যেন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এরা দুজনে যেন একজনের জন্যই আরেকজন জন্মেছে; দুজনেরই মনের গড়ন একরকম, একই আস্থা ও বিশ্বাস দুজনের; তাদের দুজনেরই হৃৎস্পন্দন যেন কোনো এক অনড় দোলকের বশবর্তী বলে মনে হলো তার–অন্তত এই কথাই তিনি স্কলাস্টিকাকে একদিন বললেন।

ঘড়ির সঙ্গে যে তুলনাটি তিনি দিয়েছিলেন, তা পুরোপুরি মাথায়–ঢুকলেও বুড়ি স্কলাস্টিকা এ-কথা শুনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে পড়লো; সাধু-সন্তদের নামে শপথ করে সে বললে যে, সিকি ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র জেনিভার এ-কথা জেনে-যাওয়া উচিত। তাকে শান্ত করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হলো জাকারিয়ুসকে; কিন্তু অনেক চেষ্টার পর জাকারিয়ুস তার কাছে থেকে এই কথা আদায় করলেন যে, কিছুতেই সে এই কথা প্রচার করবে – অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি সে আদৌ কখনো রেখেছিলো বলে কেউ জানে না।

কাজেই, জেরাঁদ আর ওবের তার বিন্দুবিসর্গও না-জানলেও আস্ত জেনিভা তাদের আশু বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলো। কিন্তু লোকে যখন এই সম্বন্ধে গাল-গল্প করে,

তখন নাকি মাঝে-মাঝে অদ্ভুত ধরনের এক খুকখুক হাসি শোনা যায়, আর কে নাকি এই কথা বলে ওঠে, জেরাঁদ কোনোদিনই ওই বরকে বিয়ে করবে না।

এই কথা শুনে লোকে ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে বেঁটেখাটো এক অচেনা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো, কিন্তু বয়স কত লোকটার? সে-কথা বলার ক্ষমতা কারুরই ছিলো না। সে বুঝি কয়েক শতাব্দী ধরে বেঁচে আছে–এ-কথাই শুধু মনে হতো লোকের। মস্ত একটি চ্যাপটামতো মাথা বসানো তার কাঁধে, আর কাঁধটি এতই চওড়া যে সারা দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান বলে মনে হয়–এবং দৈর্ঘ্য তিন ফিটের বেশি হবে না। কোনো দোলক বা পেনডুলাম বসবার আধার হতে পারে তার দেহ-বলাই বাহুল্য, ঘড়ির ডায়াল হবে তার মুখমণ্ডল, আর সমতা-রক্ষক চাকাটি অনায়াসেই তার বুকের মধ্যে দুলতে থাকবে। নাকটা প্রায় সূর্য-ঘড়ির ধরনে তৈরি যেন, এমন সংকীর্ণ ও তীক্ষ্ণ; দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক হয়ে আছে, যেন দুই ঠোঁটের মাঝখানে চাকার দাঁত দেখা যাচ্ছে ও তার গলার স্বরের মধ্যে ঘণ্টার ধাতব ধ্বনি লুকিয়ে আছে যেন, আর কান পাতলে শোনা যাবে তার হৃৎপিণ্ডটি যেন ঘড়ির মতো টিকটিক করে বাজছে। ডায়ালের মধ্যে কাটা যেমন করে ঘোরে, তেমনিভাবে হাত নাড়ে সে। কীরকম ঝাঁকুনি দিয়ে চলে সে, একবারও পিছন ফিরে তাকায় না। কেউ যদি তার পিছু নিতো তো দেখতে পেতো ঘণ্টায় সে ঠিক এক লিগ পথ হাঁটে, আর তার রাস্তা গেছে প্রায় যেন বৃত্তের মতো গোল হয়ে।

এই অদ্ভুত জীবটি খুব বেশিদিন ধরে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে–বা, বলা যায়, খুব বেশিদিন হলো এই জীবটি অন্ধকার থেকে ছাড়া পায়নি; কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রত্যেক দিন সূর্য যখন ঠিক মধ্যরেখা পেরিয়ে যায়, সাঁৎ-পিয়েরের গির্জের কাছে গিয়ে সে থেমে

পড়ে, তারপর ঠিক বেলা বারোটার ঘণ্টা বেজে যাবার পর আবার সে চলতে শুরু করে। ঠিক এই মুহূর্তটি ছাড়া শহরের যাবতীয় আড্ডা ও গাল গল্পেরই সে অংশ যেন-বিশেষ করে যেখানেই জাকারিয়ুস সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হচ্ছে, সেখানেই সে আছে; ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে লোকেরা পরস্পরকে জিগেস করতে লাগলো, জাকারিয়ুসের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে লোকটার। এটাও সবাই লক্ষ করেছিলো যে জাকারিয়ুস যখন তার কন্যার সঙ্গে বেড়াতে বেরোন, তখন এই অদ্ভুত লোকটি যেন একদৃষ্টে সারাক্ষণ জাকায়ুিসের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জেরাঁদ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে এই অপদেবতাটি তার দিকে তাকিয়ে কদাকারভাবে মুচকি হাসছে। ভয় পেয়ে সে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

কী হলো তোর? কন্যাকে জিগেশ করলেন মাস্টার জাকারিয়ুস।

জানি না, বাবা, ভীতভাবে উত্তর দিলে জেরাঁদ।

কিন্তু কি-রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোকে–পাণ্ডুর ও কালিবর্ণ। এবার কি তোর অসুখ বাধিয়ে বসার পালা নাকি? বেশ, তাহলে, বিষণ্ণভাবে একটু হাসলেন জাকারিয়ুস, আমিই তোর শুশ্রূষা করবো না-হয়, অত্যন্ত যত্ন করেই সেবা করবো তোর।

না, বাবা, তা নয়। কীরকম যেন ঠাণ্ডা লাগছে আমার–মনে হয়–

কী?

মনে হয় ওই লোকটাই এর কারণ। জানো বাবা, লোকটা সবসময়েই আমাদের পিছন-পিছন ঘোরে, অত্যন্ত নিচু গলায় সে উত্তর দিলো।

জাকারিয়ুস পিছন ফিরে বেঁটে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

বাঃ, ঠিক চলেছে তো, তার গলার স্বরে তৃপ্তির ভাবই ফুটে উঠলো। কাঁটায়-কাঁটায় চারটে বাজছে এখন। ভয় পাসনি, জেরাঁদ। ও কোনো মানুষ নয়, আসলে মস্ত একটা ঘড়ি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলো জেরাঁদ, আতঙ্কে বাবার মুখের দিকে তাকালো সে। এই অদ্ভুত জীবটির মুখে সময় দেখলেন তিনি কী করে?

হ্যাঁ, ভালো কথা, জাকারিয়ুস এ-সম্বন্ধে মোটেই মাথা ঘামালেন না, ওবেরকে যে কয়েকদিন ধরে দেখছি না!

না, বাবা, ও আমাদের ছেড়ে যায়নি, জেরাঁদের কণ্ঠস্বরে লজ্জা ও কোমলতা জেগে উঠলো।

কী করছে তাহলে আজকাল?

কাজ করছে বসে-বসে।

আহ! জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন, ও আমার ঘড়িগুলি সারাচ্ছে, তাই না? অন্তত সারাতে চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই? কিন্তু ওগুলো ও সারাতে পারবে না কিছুতেই। কারণে ওদের তো আর মেরামত করলে চলবে না, একেবারে পুনর্জীবন দিতে হবে!

মেয়ে কোনো কথা না-বলে চুপ করে রইলো।

আর-কতগুলো ঘড়ি ফিরে এসেছে, জানতে হবে, জাকারিয়ুস যোগ করলেন, আহ, যেন শয়তান নিজে এসে তাদের মধ্যে মহামারীর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

এই কথা বলে জাকারিয়ুস কি-রকম গম্ভীর আর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে আর একটাও কথা বললেন না তিনি বাড়ি ফিরে এসেই সোজা কারখানা-ঘরে চলে গেলেন–অসুখ থেকে ওঠবার পর এই প্রথম তিনি সে-ঘরে ঢুকলেন। আর তার মেয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো।

জাকারিয়ুস যেই তার কারখানা-ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন, অমনি দেয়ালের একটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা বেজে উঠলো। ঘড়িগুলো খুবই ঠিকভাবে চলতো এতকাল–সবগুলো ঘড়ি একসঙ্গে বেজে উঠত, একতিলও এদিক-ওদিক হতো না, আর জাকারিয়ুসের মন গর্ব ও উল্লাসে ভরে যেত। কিন্তু সেদিন একসঙ্গে না-বেজে পর-পর বাজলো ঘড়িগুলো, একটার পর আরেকটা, ফলে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে এই ঘণ্টাধ্বনি প্রায় যেন বধির করে দিতে চাইলো তাকে। বিষম কষ্টে ব্যথায় জাকারিয়ুস যেন ছটফট করে উঠলেন। হাতুড়ির বাড়ির মতো ঘণ্টাধ্বনি পড়ছে তার গায়ে; একটার পর একটা ঘড়ির কাছে গিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি-কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে বাজনাগুলো ইচ্ছেমতো বেজে উঠলে, কোনো সংগীত পরিচালকের যে-রকম অবস্থা হয়, তার দশাও যেমন তেমনি হলো; আর যেন এদের উপর তার কোনোরকম কর্তৃত্বই নেই।

শেষ ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ঘরের দরজা আবার দুম করে খুলে গেলো; সামনে সেই খর্বকায় বামনটিকে দেখে জাকারিয়ুসের আপাত-মস্তক যেন শিউরে উঠলো। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত লোকটি বললে, মাস্টার জাকারিয়ুস, আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?

কে তুমি? কে? জাকারিয়ুস হঠাৎ জিগেশ করে বসলেন।

আপনারই একজন সহযোগী। সূর্যের গতিবিধি শাসন করাই আমার কাজ।

ওঃ, তুমি সূর্যকে শাসন করো? একটুও বিস্মিত না-হয়ে জাকারিয়ুস তাকে সাগ্রহে বললেন, তা, এই কাজের জন্যে তোমার তোত বিশেষ প্রশংসা করতে পারবো না, বাপু। তোমার সূর্যের চলাফেরার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই–ফলে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে কখনো আমরা ঘড়ির সময় খানিকটা এগিয়ে নিই, আবার কখনো-বা পেছিয়ে দিই।

আপনি ঠিকই বলেছেন, হুজুর! ভীষণ লোকটি বলে উঠলো, আপনার ঘড়ি যেমন নিখুঁত সময়ে দ্বিপ্রহর ঘোষণা করে, আমার সূর্য সমসময় তা করে না কিন্তু একদিন লোকে বুঝতে পারবে যে, পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই এ-রকম হয়, এবং তখন একটি মধ্যক আবিষ্কার করে লোকে এই অনিয়মের মধ্যে সমতা আনবে।

ততদিন পর্যন্ত কি আর আমি বেঁচে থাকবো? জাকারিয়ুসের চোখ কেমন চক করে উঠলো।

নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবেন! আগন্তুকটি হেসে উঠলো, কেন? কোনাদিনে মরে যাবেন এ-ভয় আপনার হচ্ছে নাকি আজকাল?

হায়! সে-কথা আর কী বলবো! হঠাৎ আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

সে-সম্বন্ধেই আমার কিছু বক্তব্য আছে। শয়তান জানে, আমি সেই জন্যেই এসেছি।" এই বলে অদ্ভুত আগন্তুকটি লাফিয়ে গিয়ে বসলো চামড়ার চেয়ারে। তারপর এমনভাবে পা তুলে আড়াআড়ি ভাজ করে রইলো যে মনে হলো ঠিক যেন কোনো শিল্পীর আঁকা কোনো মড়ার খুলির তলায় কাটাকুটি করে রাখা দুটি হাড়। তারপর বিদ্রুপের ভঙ্গিতে সে বললে, কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস, তার আগে প্রথমটায় দেখে নিই এই জেনিভা নগরে কী ব্যাপার চলছে। লোকে বলাবলি করছে যে, আপনার স্বাস্থ্য নাকি ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, ফলে আপনার শরীরের ঘড়ি সারিয়ে তোলবার জন্য একজন ধন্বন্তরি নাকি জরুরি হয়ে উঠেছে।

এইসব ঘড়িগুলির সচলতা আর আমার প্রাণের মধ্যে কোনো গভীর যোগ আছে বলে মনে হয় না কি তোমার? মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন।

বাঃ রে! আমার তো মনে হয় ঘড়িগুলোর দোষের শেষ নেই–মহা বদমাশ একেকটা। এই হতচ্ছাড়াগুলি যদি শৃঙ্খলা না-মানে, যা-খুশি তাই করে তাহলে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যোগ্য প্রতিফল পাওয়া উচিত তাদের। মনে হয়, ইদানীং তাদের চরিত্রশোধনের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

উচ্ছৃঙ্খলতা কাকে বলো? তার ঠাট্টায় জাকারিয়ুস একেবারে আরক্তিম হয়ে উঠলেন। বংশমর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতে পারে না কি?

তাই বলে এতটা দম্ভ ভালো নয়। আগন্তুকের উত্তর মুহূর্তে তৈরি : স্বীকার করি, ভুবনবন্দিত একটি নামের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, তাদের আধারে এক বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর আছে, তাও মানি; তাছাড়া জগতের সব অভিজাত পরিবারে আমন্ত্রিত হবার সুযোগ যে কেবল তাদেরই আছে, তাও অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু এটা তো ঠিক যে কিছুকাল হলো তারা বিকল হয়ে পড়ছে একে-একে, আর আপনি সে-সম্বন্ধে কিছুই করতে পারছেন না। জেনিভার সবচেয়ে হাবা কারিগরও এটা আপনার কাছে মুহূর্তে প্রমাণ করে দিতে পারবে।

আমি–মাস্টার জাকারিয়ুস–আমার রুষ্ট দম্ভে জাকারিয়ুস তার কথা শেষ করতে পারলেন না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি-মাস্টার জাকারিয়ুস–এমনকী আপনিও হাজার চেষ্টা করেও আপনার ঘড়িগুলিকে সারিয়ে তুলতে পারছেন না।

বাঃ রে! হঠাৎ আমার অসুখ করে বসেছিলো বলেই তো তাদেরও অসুখ করলো, জাকারিয়ুসের সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম ছড়িয়ে পড়লো।

বাঃ, তাহলে তো ভালোই হলো : যেহেতু তাদের স্প্রিং-এ একচুলও স্থিতিস্থাপকতা আনতে পারছেন না, সেইজন্য আপনার সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও মরতে হবে।

তাদেরও মরতে হবে! মোটেই না, কারণ তুমি তো নিজেই বললে যে আমি কোনোদিনই মরবো না। আমি–জগতের এক নম্বর ঘড়িনির্মাতা মাস্টার জাকারিয়ুস–আমিই তো এইসব সূক্ষ্ম কলকজা আর নানা চাকার সাহায্যে অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রতিটি ঘড়িকে নিয়ন্ত্রিত করেছি। আমি কি বন্দী করে রাখিনি মহাকালকে–আমি কি রাজার মতো তাকে নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারি না? এই ভ্রাম্যমাণ বিশৃঙ্খল মুহূর্তগুলিকে কোনো দিব্য প্রতিভা নিয়ন্ত্রিত করার আগে কি বিশাল অনিশ্চয়তাই মানব জাতির নিয়তি ছিলো না? জীবনের একটি মুহূর্তের সঙ্গে আরেকটি মুহূর্তের কোনো যোগসূত্র ছিলো কি তখন? কিন্তু তুমি–জানি না তুমি কে, মানুষ না শয়তান–তুমি আমার এই বিরাট শিল্পের মহিমাকে একবারও তলিয়ে দেখলে না। জানো, মানুষের যাবতীয় বিজ্ঞান আমি কাজে লাগিয়েছি। না, না! আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস-আমি কিছুতেই মরতে পারি না। কারণ সময়কে শাসন করেছি আমি–বাধ্য অনুগত ও বশংবদ ভৃত্য সে আমার আমার সঙ্গে-সঙ্গে মহাকালেরও অবসান! আবার সেই অসীমে ফিরে যাবে সে; যে-অফুরন্ত সীমাহীন থেকে আমার প্রতিভা তাকে বাঁচিয়েছিলো, আবার সেই অসীম শূন্যতার তলহীন গহ্বরে সে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে–যদি আমার মৃত্যু হয় কোনোদিন! এই সৌর পরিবার যাঁর অবদান ও যাঁর সংহিতা ও বিধান কীটাণুকট থেকে বিপুল নীহারিকামণ্ডলকে বন্দী করে আছে, সেই সৃষ্টিকর্তার মতো আমিও মৃত্যুহীন! আমিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী–তারই সমান, আমি মাস্টার জাকারিয়ুস, তার শক্তি কেড়ে নিয়েছি। ঈশ্বর যদি অসীমকে সৃষ্টি করে থাকেন, কীটাণুকনাদিন! এই সে চিরকালে তাহলে আমি সৃষ্টি করেছি সীমা, সৃষ্টি করেছি সময়, অর্থাৎ ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত। দিগভ্রান্ত কিন্নরের মতো দেখালো এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে, যেন সৃষ্টিকর্তার সামনে তিনি সবেগে ও সজোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। অচেনা

আগন্তুকটি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো; এই পাপ-চিন্তা বুঝি সে-ই সংক্রামিত করেছে তার মধ্যে, এমনি মনে হয় তাকে দেখলে।

ঠিক বলেছেন, কর্তা! সে উত্তর দিলে, স্বয়ং শয়তানও নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এমন চুলচেরা তুলনা করতে পারেনি! কিছুতেই আপনার মহিমার অবসান ঘটতে দেয়া চলবে না। আর সেই জন্যই আপনার এই ভৃত্য আপনাকে এই বিদ্রোহী ঘড়িগুলিকে বশ করার উপায় জানিয়ে দিতে এসেছে।

কী সেই উপায়, খুলে বলল আমাকে, বলো! মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে। উঠলেন।

আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেই তা আপনি জানতে পারবেন। কী?

জেরাঁদ–আমার জেরাঁদের সঙ্গে–

হ্যাঁ, তাঁরই সঙ্গে।

কিন্তু আমার কন্যা তো আরেকজনকে ভালোবাসে, এই অদ্ভুত দাবিতে জাকারিয়ুস আদৌ বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হলেন না।

আপনার কন্যা ওই ঘড়িগুলোর চেয়ে কম সুন্দর নন, কিন্তু তারও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একদিন থেমে যাবে–

কে? আমার কন্যা? না! কিছুতেই না–

আপনার ঘড়ির কথাতেই তাহলে আবার ফিরে-আসা যাক। বারেবারে চেষ্টা করে দেখুন, তারা আদৌ সারে কি না! যান, আপনার সহকারীর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করুন গিয়ে। সেরা জাতের ইস্পাত কেটে বানান গিয়ে স্প্রিং। ওবের আর আপনার কন্যার চিরসুখ প্রার্থনা করুন–কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ঘড়িগুলি আর-কোনোদিনই চলবে না–আর জেরাঁদের সঙ্গেও ওবেরের বিয়ে হবে না।

এই কথা বলেই কদাকার বামনটি চলে গেলো। কিন্তু যতই সে তাড়াতাড়ি যাক, সে যাবার আগেই জাকারিয়ুস শুনতে পেলেন তার বুকের মধ্যে ঢং ঢং করে ছটা বাজলো।

৪. সাঁ পিয়েরের গির্জে

এদিকে যত দিন যাচ্ছে, মাস্টার জাকারিয়ুসও ততই দেহে ও মনে অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তবু অস্বাভাবিকরকম উত্তেজিতভাবে তিনি প্রত্যেক দিন প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে হাত দেন–কে যেন তাকে বাধ্য করে কাজ করার জন্য, তার ফলে তার কন্যা কিছুতেই তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করতে পারে না।

সেই অদ্ভুত আগন্তুকটি তাকে ভুলিয়ে অন্যায়ভাবে একেবারে সংকটের মাঝখানে নিয়ে হাজির করেছিলো; কিন্তু সেই জন্যই তিনি যেন জেদ করে আরো বেশি দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন, যেন স্থির করেছেন তার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা তিনি সমস্ত অন্যায় অপবাদ কাটিয়ে উঠবেন। জেনিভা নগরীর যে-সব ঘড়ি তার তত্ত্বাবধানে ছিলো, প্রথমে তিনি সেগুলিকে গিয়ে মেরামত করলেন! চাকাগুলি যে ভালো আছে, কীলকগুলি যে শক্ত ও সুদৃঢ় এবং ভারের সমতা যে এক চুলও নষ্ট হয়নি–তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। প্রত্যেকটি কলকব্জা, এমনকী ঘণ্টাগুলি পর্যন্ত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন–ঠিক যেমনভাবে কোনো ডাক্তার রোগীর বুক পরীক্ষা করে। ঘড়িগুলি যে কেন বিকল হয়ে পড়ছে তার কারণ কিন্তু তবু কিছুতেই আবিষ্কার করা গেলো না, হাজার চেষ্টাতেও না।

তিনি শহরের ঘড়িগুলো মেরামত করতে বেরুতেন, তার মেয়ে আর ওবের তখন প্রায়ই তার সঙ্গে যেতো। তারা যে আগ্রহভরে তার সঙ্গে যেতে চাচ্ছে, এতে যে তিনি খুশি হতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি তিনি জানতেন যে তার প্রিয়জনের জন্যই তার

জীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে, যদি তিনি জীবনের এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পারতেন যে, পিতার কিছু অংশ তার সন্তানের মধ্যে চিরকালের মতো থেকে যায়, তাহলে হয়তো তার আয়ু যে শেষ হয়ে আসছে, এই চিন্তায় তিনি এমনভাবে মগ্ন ও তন্ময় হয়ে পড়তেন না।

বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা যেন কেমন একটা জ্বরাতুরভাবে আবার উঠে-পড়ে তার কাজে লাগতেন। তাঁর যে সাফল্যলাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এটা যদিও তাকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করা হলো, তবু তিনি এ-ব্যাপারটা যে সম্ভব তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না। অবিশ্রান্তভাবে ঘড়িগুলির কলকজা খুলে দ্যাখেন তিনি, তারপর এক-এক করে আবার সব জোড়া লাগান, পরাজয় অনিবার্য জেনেও কিছুতেই হাল ছাড়েন না।

সমস্ত গণ্ডগোলের মূল কারণটা খুঁজে বের করার জন্য ওবের কেবল নিজেকেই কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়–কিন্তু কোনো ফল হয় না। নিশ্চয়ই কীলক আর চাকার দাঁতগুলি কোনো কারণে খয়ে যায় তাই

তুমি আমাকে তিলেতিলে কষ্ট দিয়ে মারতে চাও? অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন মাস্টার জাকারিয়ুস। এই ঘড়িগুলো কি ছেলেখেলা মাত্র? ছোটোদের খেলনা? লেদ-এ চাপিয়ে এই তামার পাতগুলি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে আঙুলে আঘাত লাগেনি আমার? যাতে তারা আরো শক্তি পায় এই জন্য আমি কি নিজের হাতে আগুনে গালিয়ে গড়ে-পিঠে এই তামার টুকরোগুলো তৈরি করিনি? এই স্প্রিংগুলি কি উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা নয়? আমার চেয়ে পালা তেল কি আর-কেউ ব্যবহার করতে পারতো? তা যে অসম্ভব তা তুমি

নিজেই জানো-ফলে তোমাকে এটা বলতেই হবে যে, এগুলিকে নিশ্চয়ই শনিতে কিংবা শয়তানে পেয়েছে।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একের পর এক রুষ্ট ক্রেতারা এসে বাড়িতে চড়াও হয়–জাকারিয়ুসের সঙ্গে দেখা না-করে ফেরে না কেউ–আর সবাই মিলে এমন হৈ-চৈ করে যে, কার কথায় যে কান দেবেন জাকারিয়ুস তা ভেবেই পান না।

কেবলই পিছিয়ে পড়ে আমার ঘড়িটা-হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই ঠিক সময় দেয় না, কেউ অভিযোগ করে।

কেউ-বা বলে, এই ঘড়িটা এত একগুঁয়ে যে এক চুলও নড়ে না–জোশুয়ার সূর্যের মতো নিশ্চল কেবল দাঁড়িয়েই থাকে।

আর এ-কথা যদি সত্যি হয় যে, অনেকেই এ-কথা বলে যায়, আপনার ঘড়িগুলিতে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়ে, তাহলে দয়া করে যত শিগগির সম্ভব সেরে-ওঠার চেষ্টা করুন।

জাকারিয়ুস শুধু উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে, আর কেবলই মাথা নাড়েন, নয়তো বিষণ্ণভাবে বলে ওঠেন : বসন্তকাল আসুক–অন্তত ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। বসন্তকালে তো জীর্ণ ও জরাগ্রস্তও নতুন করে প্রাণ পেয়ে যায় যেন। সূর্য চাই আমাদের, যাতে ঠাণ্ডা রক্তও গরম হয়ে ওঠে।

বাঃ চমৎকার! সারা শীতকাল ধরে ঘড়িটা যদি রোগে ভোগে, তাহলেই হয়েছে; রেগে বলে ওঠে কেউ-কেউ। আধারের উপরে যে আপনার নামটা স্পষ্ট করে লেখা আছে, তা কি আপনি ভুলে গেছেন, মাস্টার জাকারিয়ুস? ঈশ্বরের দোহাই, নিজের স্বাক্ষরের মর্যাদা রাখার জন্য একটু চেষ্টা করুন।

শেষকালে এমন হয়ে উঠলো, লোকের তিরস্কার আর সহ্য করতে-পেরে এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা পুরোনো সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রা বের করে এক-এক করে সবগুলি বিকল ঘড়িই আবার কিনে নিতে লাগলেন। এ-কথা শুনে ক্রেতারা দল বেঁধে আসতে লাগলো, আর জলের মতো বেরিয়ে যেতে থাকলো তার সব টাকা। কিন্তু তার সততায় একটিও আঁচড় পড়লো না। জেরাঁদ কিন্তু সাগ্রহে তার এই সম্মানবোধের প্রশংসা করলে-অথচ এই জন্য ক্রমে তার সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার জোগাড় হলো; শেষকালে ওবের নিজের জমানো টাকাও তার গুরুদেবকে নিবেদন করতে চাইলো।

পিতৃস্নেহের এই ভরাডুবির মধ্যেও মাঝে-মাঝে কাঠকুটো আঁকড়ে ধরতে চান জাকারিয়ুস, শেষকালে আমার মেয়ের কী হবে?

সাহস সঞ্চয় করে ওবের কিছুতেই আর এ-কথা বলতে পারে না যে ভবিষ্যতের উপর তার অসীম আস্থা ও প্রত্যাশা আছে; সে-যে জেরাঁদকে গভীরভাবে ভালোবাসে, এ-কথাটি সে আর প্রকাশ করে বলতে পারে না। সেদিন যদি সাহস করে বলতে পারতো, মাস্টার জাকারিয়ুস হয়তো তক্ষুনি তাকে তার কন্যাজামাতা-রূপে গ্রহণ করে সেই অলুক্ষুণে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিতেন।জেরাঁদের সঙ্গে ওবেরের বিয়ে? উঁহু, কোনোদিনই হবে না, এই ভয়ংকর কথাটি এখনো তার কানে অবিশ্রাম গুঞ্জন করে ফেরে।

বিকল ঘড়িগুলি কিনে-নিতে নিতে জাকারিয়ুস শেষকালে যেন দেউলে হয়ে গেলেন। কারুকাজ-করা দামি-দামি সব পুরোনো বাসন-কোশন সব অচেনা লোকের হাতে তুলে দিলেন তিনি, বাড়ির দেয়ালে কাজ-করা যে-সব সুন্দর প্যানেল ছিলো, সব তিনি বেচে দিলেন। প্রাচীন ফ্লেমিশ শিল্পীদের আশ্চর্য ছবিগুলি আর জেরাঁদের চোখে পড়ে না। সব তিনি বেচে দিলেন–এমনকী তিনি নিজে যে-সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন, তাও এই হুলস্থূলের মধ্যে ক্রেতাদের তুষ্ট করার জন্য বেচে দিতে হলো।

কেবল স্কলাস্টিকাই এ-সম্বন্ধে কারু কাজে কোনোরকম যুক্তিতর্ক শুনতে চাইতো না। কিন্তু এইসব নাছোড়বান্দা লোকগুলিকেও সে কিছুতেই আটকাতে পারতো না–প্রভুর সঙ্গে দেখা করে শেষ পর্যন্ত তারা কোনো-না-কোনো দুমূল্য জিনিশ নিয়ে চলে যেতো–কোনোরকমেই সে তাতে বাধা দিতে পারতো না। ফলে তার একটানা চ্যাঁচামেচিতে সমস্ত পাড়া তারপর মুখর হয়ে উঠতো–পাড়ার লোকের কাছে অবশ্য আগে থেকেই তার মুখের খ্যাতি ছিলো। তার প্রভু ডাকিনীতন্ত্রের উপাসক, আসলে তিনি একজন কালো জাদুকর মাত্র–এই-যে জনরব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো, দৃঢ় স্বরে সে তার প্রতিবাদ করতো; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে শেষটায় তারও মনে হলো বোধকরি ব্যাপারটায় কিঞ্চিৎ সত্য আছে–তাই বারেবারে তার এই শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো ঈশ্বরের কাছে।

মাস্টার জাকারিয়ুস যে ইদানীং ধর্মকর্মে অত্যন্ত অবহেলা করছেন, এটা সকলেই খেয়াল করছিলো। এককালে তিনি মেয়েকে নিয়ে নিয়মিত গির্জেয় যেতেন–মানুষের কল্পনার মহিমা ও বিপুলতা অনুভব করতেন তিনি প্রার্থনা–সভায়–প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের

যেমন হয়, তারও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এই স্তব ও স্তোত্রের সেই গভীর আবেদন ছিলো! অথচ এখন তাকে আর কখনও গিঞ্জেয় দেখা যায় না; তা ছাড়া মানুষটাও কিছুটা চাপা স্বভাবের–তার চারপাশে যেন অসীম রহস্য ছড়িয়ে আছে; ফলে তার সঙ্গে এবার তার সেই প্রার্থনাসভার যোগদানে অবহেলাটি যোগ হয়ে লোকের সন্দেহ ও অভিযোগকে আরো দৃঢ় করে তুললো। পিতা যাতে ঈশ্বর এবং জগতের কাছে আবার ফিরে আসেন, এই দুই কারণেই জেরাঁদ ধর্মের সাহায্য নেবে বলে স্থির করলে। তাঁর ম্রিয়মাণ আত্মায় হয়তো সঞ্জীবনীর কাজ করবে ধর্ম–অন্তত জেরাঁদের তাই মনে হলো, কিন্তু আস্থা, দীনতা ও বিনতির সঙ্গে অনতিক্রম্য এক দম্ভের প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হলো জাকারিয়ুসের হৃদয়ে; বিজ্ঞানের অহংকারের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হলো অন্তিম গুণ দীনতার, কেননা বিজ্ঞান তো কেবলি সব-কিছুকে নিজের সঙ্গে জুড়ে দিতে চায়; প্রথম নিয়মের সূত্রগুলি যে একদিন কোনো অসীম থেকেই উৎসারিত হয়েছিলো, বিজ্ঞান এটা তাকিয়ে দেখতে চায় না।

জাকারিয়ুসের মনের মধ্যে বিজ্ঞানই যখন সর্বেসর্বা, তখন এই তরুণী তার বাবাকে ফেরাতে চাইলে :নতুন করে তাঁকে দীক্ষিত করতে চাইলে জেরাঁদ; আর তার প্রভাব এতটাই কার্যকরী হলো যে, বৃদ্ধ জাকারিয়ুস পরের রোববারে গিঞ্জেয় গিয়ে প্রার্থনাসভায় যোগ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শুনে মেয়ের মন আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে ভরে গেলো, যেন এতদিনে সে স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে। বুড়ি স্কলাস্টিকা তো তার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলো না; এতদিনে সে সমস্ত গুজব ও জনরবের যোগ্য উত্তরটি দিতে পারবে, আর যে-ই তার প্রভুকে ম্লেচ্ছ ও অধর্মাচারী বলতে আসুক, সে তাকে এই দুর্ধর্ষ যুক্তিটি দেখিয়ে দেবে। পাড়াপড়শিদের সবাইকে এই শুভ সংবাদ দিয়ে এলো সে, শত্রু-মিত্র, চেনা-অচেনা–এই খবর না-শুনিয়ে কাউকেই সে ছাড়লো না।

তাই নাকি! সত্যি? তোমার কথা তো বিশ্বাসই হতে চাচ্ছে না, স্কলাস্টিকা। লোকে তাকে বললো, মাস্টার জাকারিয়ুস তো এতকাল শয়তানের সঙ্গেই শলা-পরামর্শ করতেন!

তাহলে তোমরা শোনোনি তাঁর ঘড়ির ঘণ্টাগুলো কেমন আশ্চর্যভাবে বেজে ওঠে,বুড়ি দাসী তাদের বলে দিলে, ওই ঘণ্টাগুলিই ঢং-ঢং করে বেজে প্রার্থনাসভার সময় ঘোষণা করেছে এতকাল।

তা মানি। কিন্তু তিনি কি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেননি যা আপনা থেকেই চলে–ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষের মতো কাজ করে যায়?

সেই-যে তিনি আশ্চর্য একটা লোহার ঘড়ি বানিয়েছিলেন, টাকা ছিলো না বলে জেনিভার লোক যা কিনতে পারেনি, আন্দেরনাৎ-এর এক বাগানবাড়িতে যেটা এখন আছে, রেগে ফুঁসে উঠলো স্কলাস্টিকা, কোনো শয়তানের কোনো সাধ্য ছিলো কি তেমন ঘড়ি বানায়? ঘণ্টায়-ঘণ্টায় একেকটি নীতি-বাক্য বেরিয়ে আসে ডায়াল থেকে–ওই নীতিগুলি পালন করলে যে কোনো ধর্মভীরু খ্রিষ্টানই সোজা স্বর্গে চলে যাবে! একে কি কখনো শয়তানের কাজ বলা চলে?

সত্যিই, এই ঘড়িটা জাকারিয়ুসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কুড়ি বছর আগে তিনি বানিয়েছিলেন এটা, আর এটার জন্যই খ্যাতির একেবারে শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি না তার সম্বন্ধে ডাকিনীতন্ত্রের কথা ওঠে। তবে জাকারিয়ুস গির্জেয় গেলে অন্তত এই হবে যে, লোকের পিশুনভরা কথা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

কন্যাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মাস্টার জাকারিয়ুস কিন্তু তা একবারেই ভুলে গিয়েছিলেন; সকালবেলায় সোজা তিনি তাঁর কারখানায় চলে যান। বিকল ঘড়িগুলিকে পুনর্জীবন দেবার ক্ষমতা যে তার মোটেই নেই, এটা বুঝতে পেরে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কোনো নতুন ঘড়ি বানাতে পারেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবেন। সমস্ত বিফল চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার কেলাস-ঘড়িটা শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন : তার ধারণা ছিলো এই ঘড়িটাই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে। কিন্তু খামকাই তিনি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেন, ঘর্ষণ রোধ করবার জন্য খামকাই তিনি চুনি আর হিরে বসালেন ঘড়িতে; কারণ ঘড়িটায় যেই তিনি দম দেবার চেষ্টা করলেন, অমনি সেটা তার হাত থেকে পড়ে গেলো।

এই ঘটনাটা তিনি সকলের কাছে চেপে গেলেন–এমনকী তার কন্যাকেও বললেন না; কিন্তু তারপর থেকেই তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়তে লাগলো। যেন ক্রমশ-মন্থর হয়ে যাচ্ছে এমন-এক দোলক হয়ে গেলেন তিনি, যার মূল শক্তি আর বেগ কিছুতেই ফিরে আসবে না–যেন শেষবারের মতো আন্দোলিত হচ্ছে সে, তারপর আস্তে আস্তে একদিন থেমে যাবে। কোনো-এক অপ্রতিরোধ্য অভিকর্ষ যেন সোজাসুজি তার উপর কাজ করে যাচ্ছে–অনিবার্যভাবে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কবরের দিকে।

জেরাঁদ এত উৎসুকভাবে যে-রোববারের প্রতীক্ষা করছিলো অবশেষে তা এলো। আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো-আকাশ স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময়; তাপমাত্রা যেন প্রেরণা জাগায়। জেনিভার লোকেরা রাস্তায় বেরিয়েছে দল বেঁধে : বসন্ত। যে আবার ফিরে এলো, খুশি হয়ে এই কথা বলাবলি করতে-করতে যাচ্ছে তারা। অত্যন্ত কোমলভাবে বাপের হাত ধরে গির্জের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। জেরাঁদ। স্তবকবচমালা নিয়ে স্কলাস্টিকা চললো

পিছনে। রাস্তায় লোকেরা কৌতূহলের সঙ্গে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো যে, বাচ্চা ছেলেকে যেভাবে ধরে-ধরে হাঁটতে শেখানো হয়, তেমনিভাবে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে–না, বাচ্চা ছেলে নয়, আসলে যেন কোনো অন্ধকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেরাঁদ। সাঁৎ-পিয়েরের অনুগতরা যখন দেখলো চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি গির্জেয় ঢুকলেন, তাঁকে আসতে দেখেই কোনো-এক অজ্ঞাত বিষম ভয়ে ভরে গেলো তারা।

সারা গির্জে তখন স্তবগানে মুখর। প্রতিবার যেখানে গিয়ে বসে, জেরাঁদ সেখানে গিয়ে ভক্তি ও বিনতিভরে অত্যন্ত সরলভাবে নতজানু হয়ে বসলো। মাস্টার জাকারিয়ুস কিন্তু তার পাশে সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন, অনমনীয় ও ঋজু।

সে-যুগ বিশ্বাসের যুগ। শ্রদ্ধাশীলভাবে অনুষ্ঠানটি ধীরে-ধীরে সেই উন্নত মহিমার স্মরণ করলো–কিন্তু এই বৃদ্ধের মনে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার লেশমাত্র ছিলো না। যে-তীব্র যন্ত্রণায় মানবজাতি ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করে কাতরভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, তার অন্তর তাতে সায় বা সাড়া কিছুই দিলো না। চূড়ান্ত মহিমা গানটিতে যোগ দিয়ে তিনি সেই ঐশ্বরিক দীপ্তির গৌরব ঘোষণা করলেন না; সুসমাচারের বাণী তাঁকে তাঁর অচিৎ জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না; এমনকী শেষের সেই সমবেত স্তবগানেও তিনি যোগ দিলেন না। অহংকারে দৃপ্ত এই বৃদ্ধ কেবল নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন–পাথরের মূর্তির মতো যেন তিনি তেমনি নিঃসাড় ও তেমনি স্তব্ধ। এমনকী যখন রুটি আর মদের সেই দিব্য রূপান্তর স্মরণ করে ঘণ্টা বেজে উঠলো, খ্রিষ্টের সেই রক্ত-মাংসের বেদনাতেও তিনি মাথা নোয়ালেন না, শুধু অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন পুরোহিত কেমন করে নতজানু ভক্তদের ঐশী আমন্ত্রণ পাঠালেন। বাবার দিকে তাকিয়েই জেরাঁদের দু-চোখ ঘন

অশ্রুবাষ্পে ঝাঁপশা হয়ে গেলো। ঠিক সেই সময়ে সাঁৎ-পিয়েরের গির্জের মস্ত ঘড়িটায় ঘণ্টা বেজে উঠলো : সাড়ে-এগারো বাজে। মাস্টার জাকারিয়ুস সেই প্রাচীন ও বাদ্যয় ঘড়িটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তক্ষুনি। তাঁর মনে হলো ঘড়িটা যেন অনিমেষ লোচনে তার দিকে তাকিয়ে আছে; এক থেকে বারো–প্রতিটি সংখ্যা এমন ভাবে জ্বলছে, জ্বলজ্বল করছে যেন রাঙা অঙ্গার দিয়ে লেখা; ঘড়ির কাটা থেকে যেন বিদ্যুতের ফুলকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে।

স্তবগান শেষ হলো। গীর্জের রীতি অনুযায়ী বেলা দ্বিপ্রহরে দেবদূতের জয়গান করা হয়; তাই বেদী ছেড়ে যাবার আগে পুরোহিতেরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়ে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই এই স্তব তারা সেই ঐশী কুমারীর চরণে নিবেদন করে দেবেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা কর্কশ আওয়াজে গিঞ্জের সেই বিনত পরিবেশে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন জাকারিয়ুস।

ঘড়ির কাঁটাটা বারোটার ঘরে গিয়ে হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেছে, কোনোদিনই আর এই ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজবে না।

তাড়াতাড়ি বাপের দিকে ছুটে গেলো জেরাঁদ। ছিন্ন গাছের মতো নিশ্চ পড়ে গেছেন তিনি মাটিতে; ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

মরণকামড় এটা! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জেরাঁদ।

ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো তাকে; বিধ্বস্তের মতো তিনি পড়ে রইলেন–ব্যথায় একেবারে চুরমার হয়ে গেছেন যেন। যেন প্রাণ আস্তে-আস্তে তার দেহ থেকে অন্তর্ধান করছে।

মূর্ছা ভেঙে গেলে দেখলেন জেরাঁদ আর ওবের তার পাশে ঝুঁকে আছে। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে ভবিষ্যৎকে তিনি এখুনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। জেরাঁদ যেন কোনো একাকিনী, সহায়সম্বলহীনা, বিষাদ-প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে, এটাই তার মনে হলো।

পুত্র, ওবেরকে তিনি বললেন, আমার কন্যাকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম। এই বলে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যাতেই তারা দুজনে মিলিত হলো।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন কোনো পরম রোষে তার সমস্ত অস্তিত্ব ভরে গেলো। উঠে বসতে চাইলেন তিনি, ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ। সেই ভীষণ আগন্তুকটির কথা যেন এক অবিশ্রাম স্রোতের মতো তার বুকে বয়ে গেলো।

না-না, মরতে চাই না আমি। প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে উঠলেন জাকারিযুস। কিছুতেই মরতে পারি না আমি! আমি মাস্টার জাকারিয়ুস আমার মরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার খাতা–আমার হিশেবের খাতা!

এই বলে তিনি লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে, হিশেবের খাতাটা বের করে আনলেন তাড়াতাড়ি। এই খাতায় ক্রেতাদের নাম-ঠিকানা আর ঘড়ির বর্ণনা লেখা থাকে।

তাড়াতাড়ি তার পাতা উলটে গেলেন ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত হাতে-শেষকালে বইয়ের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি।

এই যে! চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস। এই যে! পিত্তোনাচ্চিয়োকে যে-লোহার ঘড়িটা বিক্রি করেছিলুম, দ্যাখো, কেবল সেটাই আমার কাছে ফিরে আসেনি। এখনো ঘড়িটা চলছে-ঘড়িটা চাই! এখনো তা নষ্ট হয়ে যায়নি এখনো তা বেঁচে আছে! আঃ, এই আমার প্রাণ–যে করেই হোক এই ঘড়িটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। ঘড়িটাকে আমি এত যত্ন করে সাবধানে রেখে দেবো যে মৃত্যু আর আমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।

বলতে-বলতে আবার তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

ওবের আর জেরাঁদ এই বিদ্রোহী বৃদ্ধের শয্যার পাশে নতজানু হয়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

৫. ঘণ্টা বাজলো

এক-এক করে কত দিন কেটে গেছে। যেন কোনো অতিপ্রাকৃত উত্তেজনা তাকে এসে অধিকার করেছে–তাই রোগশয্যা ছেড়ে কেমন করে যেন উঠেছেন মাস্টার জাকারিয়ুস, আবার কাজে হাত দিয়েছেন তিনি–যেন কোনো অমানুষিক শক্তি পেয়েছেন তিনি কোনোখান থেকে। যেন তার অহংকারই তাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু জেরাঁদ আর নিজেকে প্রতারিত করলো না–তার পিতার দেহ ও মন চিরকালের মতো কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেছে, এটা সে অবশেষে মেনে নিলো। পোষ্য কিংবা নির্ভরশীলদের কথা মোটেই চিন্তা না-করে জাকারিয়ুস তার শেষ কপদকটুকু পর্যন্ত এক জায়গায় জড়ো করেছেন। কোনো-এক অস্বাভাবিক বল পেয়েছেন যেন তিনি কোত্থেকে–অফুরন্ত যেন তার উৎস : তার হাঁটা-চলায়, কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় তা-ই ফুটে বেরোয়–আর সবসময় বিড়বিড় করে অস্ফুট ভাবে কী যে বলেন তিনি–তার সব কথা স্পষ্ট বোঝাও যায় না।

একদিন সকালে জেরাঁদ তার কারখানা ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, তিনি সেখানে নেই। সারাদিন সে তার জন্যে অপেক্ষা করে কাটালো-কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর ফিরে এলেন না। সে বিলাপ করলো সারা দিন, কিন্তু তার বাবা আর ফিরলেন না।

সমস্ত জেনিভা তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওবের যখন তাঁকে কোথাও পেলো, তখন এটা অনুমান করা গেলো যে, তিনি শহর ছেড়েই চলে গেছেন।

কিন্তু খুঁজে তাকে বের করতেই হবে, ওবের বিষণ্ণ খবরটা পৌঁছে দিতেই জেরাঁদ কেঁদে উঠলো।

কোথায় যেতে পারেন তিনি? নিজেকে শুধোলো ওবের।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক প্রেরণা এলো তার মনে। মাস্টার জাকারিয়ুসের শেষ কথাগুলি মনে পড়ে গেলো তার। যে-একটি পুরোনো লোহার ঘড়ি এখনো ফেরত আসেনি, তার প্রাণ নাকি কেবল তার মধ্যেই রয়েছে এখন? নিশ্চয়ই তিনি সেই ঘড়িটারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।

ওবের তার ধারণা খুলে বললো জেরাঁদাকে।

বাবার হিশেবের খাতাটা দেখলেই তো হয়, জেরাঁদ বললো।

তক্ষুনি জাকারিয়ুসের কারখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকলো তারা। হিশেবের খাতাটা খোলাই পড়েছিলো একটি বেঞ্চির উপর। বিকল হয়ে গেছে বলে জাকারিয়ুসের তৈরি সবগুলি ঘড়িই ফিরে এসেছিলো, লাল কালি দিয়ে সেগুলি তিনি কেটে রেখেছেন–কেবল একটি বাদে।

মসিঁয় পিত্তোনাচ্চিয়োর কাছে ঘণ্টা আর সচল মূর্তি সমেত একটি লোহার ঘড়ি বিক্রি করা হলো; আন্দেরনাৎ-এ তার বাগানবাড়িতে পাঠানো হয়েছে সেটা।

এটাই হলো সেই আদর্শ ঘড়ি স্কলাস্টিকা যার সম্বন্ধে সোৎসাহে বাত্ময় হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই বাবা সেখানে গেছেন, বললো জেরাঁদ।

চলো, আমরাও সেখানে যাই, ওবের উত্তর দিলো, হয়তো এখনো তাকে বাঁচানো যাবে!

প্রাণে বাঁচবেন না বটে, অস্ফুট স্বরে বললো জেরাঁদ, কিন্তু অন্তত তার । আত্মা রক্ষা পেতে পারে।

কী সর্বনাশ! জেরাঁদ, আন্দেরনাৎ-এর বাগানবাড়িটা কোথায়, তা জানো? দেনস-দু-মিদির গিরিসংকটে–জেনিভা থেকে যেতে কুড়ি ঘণ্টা লাগে। চলো, আর দেরি নয়, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

লেমান্ হ্রদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে যে-পথটা দিগন্তের দিকে চলে গেছে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় স্কলাস্টিকাকে সঙ্গে নিয়ে ওবের আর জেরাঁদ সেই পথে রওনা হয়ে পড়লো। সে-রাত্রে পাঁচ লিগ পথ পেরিয়ে এলো-বেসঁজ বা এরমাস মেঅর-দের বিখ্যাত বাগানবাড়ি–কোথাও তারা থামলো না। অনেক কষ্টে তারা হেঁটেই পেরোলো ভঁজ-এর পাহাড়ি নদী–আর যেখানেই গেলো সেখানেই জাকারিয়ুসের খোঁজ নিলো তারা, এবং একটু পরেই এটা বুঝতে পারলো যে ঠিক পথেই তারা যাচ্ছে, কোনো ভুল করেনি।

পরের দিন ভোরবেলায় তোন পেরিয়ে এভিয়াতে এসে পৌঁছোলো তারা–আর মাত্র বারো লিগ দূরে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত। কিন্তু বাগদত্তা এই যুবক-যুবতী এই ভুবন-মোহন সম্ভাবনাটার কথা একবার ভেবেও দেখলো না। সোজা তারা সামনে দিকে এগিয়ে গেলো–যেন কোনো অমানুষিক শক্তি তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। ওবেরের হাতে একটি বাঁকা ছড়ি রয়েছে; কখনো জেরাঁদকে, কখনো-বা স্কলাস্টিকাকে হাত ধরে-ধরে

নিয়ে যাচ্ছে সে; তারা যাতে কোনোরকমে অবসাদে বা শ্রান্তিতে ভেঙে-না পড়ে, যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সে-বিষয়ে। আর তাদের গভীর বেদনা ও অমল প্রত্যাশার কথা নদীর ধারের এই সুন্দর পথটিতে বারে বারে মুখর হয়ে উঠলো। হ্রদের দুই পাড় যেখানে শ্যালেই-এর উচ্চতায় এসে পড়েছে, অবশেষে সেই উঁচু ও সংকীর্ণ মালভূমিতে এসে পৌঁছুলো তারা। তারপর দ্রুত এসে পৌঁছুলো ব্যুভের-এ-রোননদী আর জেনিভা হ্রদের সংগম যেটা।

ব্যুভের চেড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে হ্রদের পাশ থেকে বেঁকে দূরে চলে গেলো তাদের পথ। আর এই পাহাড়ি পথে তাদের শ্রান্তি ও অবসাদ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। একে-একে তারা পেরিয়ে এলো জনবিরল পাহাড়ি গ্রামগুলি–ফিয়োনাৎস, শেস, আর কলম্বে। তাদের হাঁটুর জোড়া খুলে আসতে চাচ্ছে তখন, গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত ও বন্ধুর পাহাড়ি পথে চলায় বেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে তাদের পা–কিন্তু তবু মাস্টার জাকারিয়ুসের কোনো সন্ধান নেই কোথাও।

কিন্তু খুঁজে তাকে বের করতেই হবে। তাই তারা কোনো ক্ষুদ্র পল্লি বা মোতা-র প্রমোদবীথিকায় বিশ্রাম নেবার কথা ভাবতে পারলে না। অথচ এই প্রমোদবীথিকাই বিস্তৃত হয়ে দূরের দিকে গেছে এখান থেকে, আর একদা শ্যাভয়-এর মার্গারিৎ এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবশেষে, অবসাদে তারা যখন অর্ধমৃত সেই সময়ে নোত্র-দাম-দু সেক্স-এর মঠে পৌঁছুলো তারা। দেন-দু মিদির ঠিক তলাতেই এই বীথিকা, রোননদী ঠিক ছশো ফিট উপরে।

রাত করে এসেছে তখন; তিন পথিকের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন যাজক। তখন তাদের আর এক পাও যাবার ক্ষমতা নেই, ফলে এখানে বিশ্রাম নিতে তারা বাধ্যই হলো একরকম।

যাজকটি কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুসের কোনো খবরই দিতে পারলেন না। কী-রকম যেন বিষাদ ভরা এই নিঃসঙ্গ পাহাড়ি পথ–এখানে যদি কোথাও তিনি পড়ে গিয়ে মরেও যান, কেউ তার কোনো খোঁজই পাবে না। বাইরে গভীর অন্ধকার করে এলো, আর হাওয়া যেন ক্ষুধিতের মতো গর্জন করে ফিরলো পাহাড়ের গায়ে-গায়ে-চূড়া থেকে ধস নেমে পড়লো প্রকাণ্ড চীৎকার করে–যেন এই আঁধার রাতে হঠাৎ ক্ষুব্ধ পাহাড়টি তার সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠেছে।

যাজকের চুল্লির সামনে কুঁকড়ে বসে ওবের আর জেরাঁদ ধীরে-ধীরে তাঁকে এই করুণ ও শোকার্ত কাহিনীটি খুলে বললো। তুষার ঝরে পড়েছিলো তাদের পোশাকে–এক কোনায় সেগুলি শুকোচ্ছে। আর বাইরে চাঁদের এক রাঙা-ভাঙা টুকরো দেখে ডুকরে কেঁদে উঠছে মঠের কুকুরটি–আর বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সেই বিলাপ যেন অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে।

দম্ভ,আস্তে-আস্তে যাজকটি তার অতিথিদের বললেন, দম্ভই এক দেবতার ধ্বংস ঘটিয়েছিলো একদা। এই ভয়ংকর দেয়ালের গায়েই মানুষের অদৃষ্ট বারে বারে আছড়ে পড়ে মাথা কোটে। দম্ভ কি আর কোনো যুক্তির কথা শোনে! অহংকারের চেয়ে সর্বনেশে অধর্ম আর কিছু নেই, কেননা তার স্বভাবই হচ্ছে কোনো কথায় কর্ণপাত না-করা। তোমার বাবার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া

আর-কিছুই করার নেই।

চারজনে যেই নতজানু হয়ে বসেছে, অমনি বাইরে কুকুরটি হঠাৎ দ্বিগুণ জোরে ডুকরে-উঠলো : কে যেন মঠের দুয়ারে এসে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

খোলো, দরজা খোলো-শয়তানের নামে বলছি, দরজা খোলো–

হঠাৎ প্রবল করাঘাতে দরজা খুলে গেলো, আর জীর্ণ বসনপরা বিস্রস্ত ও উদ্ভ্রান্ত কে একজন এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

বাবা! তুমি! জেরাঁদ চেঁচিয়ে উঠলো।

সত্যি, মাস্টার জাকারিয়ুসই বটে।

কোথায় আছি আমি, জানো? উদ্ভ্রান্ত গলায় বলে উঠলেন জাকারিয়ুস। অসীমের মধ্যে–চিরন্তনতায়। সময় থেমে গেছে–আর কোনোদিনও ঘণ্টা বাজবে না–সমস্ত ঘড়ির কাঁটাগুলি খশে পড়লো!

বাবা! মেয়ের এই করুণ আর্তনাদই বোধকরি বৃদ্ধকে হঠাৎ জীবিতের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। জেরাঁদ? তুমি এখানে। চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস, আর ওবের? তুমিও। ওঃ, বাদত্ত বলে এই পুরোনো গিঞ্জেয় বিয়ে করতে এসেছে তোমরা।

বাবা, তার হাত ধরে অনুনয় করলো জেরাঁদ, ফিরে এসো, আমাদের সঙ্গে জেনিভায় ফিরে এসো তুমি।

হ্যাঁচকা টানে হাত ছিনিয়ে নিলেন জাকারিয়ুস তারপর ক্ষিপ্র গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন; বাইরে তখন অজস্র ধারায় বড়ো-বড়ো তুষার ঝরে পড়ছে।

সন্তানদের ত্যাগ করে যাবেন না, ওবের চীৎকার করে বললো।

কেন ফিরবো? যেন মূর্তিমান বিষাদ কোনো বিষম দূর থেকে কথা বলে উঠলো। যেখানে আমার জীবন আর নেই, যেখানে আমার একটা অংশ চিরকালের মতো সমাহিত হয়ে গেছে, সেখানে আর কীসের জন্য ফিরে আসবো?

কিন্তু আপনার আত্মা? সে তো মরেনি! জানি তার চাকাটা ভালো আছে–তার টিকটিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি–

আত্মা তো কোনো অচিৎ পর্দায় নয়–সে অবিনশ্বর, সে চিরন্তন,তীব্র স্বরে বলে উঠলেন যাজক।

হ্যাঁ, ঠিক আমার মহিমার মতো। কিন্তু সে এখন আন্দেরনাৎ-এর প্রমোদবীথিকায় বন্দী হয়ে আছে–আমি তাকে দেখতে চাই আবার মুখোমুখি দেখতে চাই তাকে।

বুকে ক্রুশ আঁকলেন যাজক; স্কলাস্টিকা কেমন নির্জীব হয়ে পড়লো হঠাৎ, ওবের জেরাঁদকে জড়িয়ে ধরলো।

আন্দেরনাৎ-এর সেই কেল্লায় যে থাকে, সে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে–সে অভিশপ্ত–তার উদ্ধারের কোনো উপায়ই নেই। সে ক্রুশকে সম্মান করে না–তার মুক্তি হবে কেমন করে?

বাবা, যেয়ো না ওখানে, যেয়ো না!

আমার আত্মাকে ফিরে চাই আমি। আমার আত্মা তো আমারই–

ধরো ওকে, আটকাও, জেরাঁদ চীৎকার করে উঠলো।

কিন্তু এক লাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে চলে গেলেন বৃদ্ধ। রাতের অন্ধকারে কেবল এক অফুরন্ত আর্তনাদ শোনো গেলো : আত্মা, আমার আত্মা, আমার আত্মা...

জেরাঁদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা–তিনজনেই তাঁর পিছন-পিছন ছুটলো। দুর্গম এখানকার পথ, কুটিল আর জটিল আর কষ্টকর। আর সেই পথ ধরেই যাচ্ছেন মাস্টার জাকারিয়ুস, যেন কোনো ক্ষিপ্ত ঝড় বয়ে যাচ্ছে, যেন কোনো ভয়ংকার চুম্বক তাকে সবেগে টান দিয়েছে। পরম আক্রোশে তুষার ঝরছে তাদের উপর, শাদা টুকরোগুলি ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে শুভ্র হিম অঙ্গারের মতো।

থীবান বাহিনীর ভীষণ সংহারের স্মরণে যে-গির্জেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়ি তারা বুকে ক্রুশ এঁকে দিল। কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুসকে কোথাও দেখা গেলো না।

সেই বন্ধ্যা ভূমিতে অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে এফিয়োনাৎস নামে ক্ষুদ্র পল্লিটি জেগে উঠলো। ভীষণ নির্জনতার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লিটি দেখে অত্যন্ত কঠোর লোকও কেঁপে উঠতো। বৃদ্ধ কিন্তু ঝড়ের মতো এগিয়ে চললেন দেন-দুমিদির গিরিখাতে, যেখানে তার তীক্ষ্ণ চূড়া আকাশকে ভেদ করে উঠে গেছে, তার গভীরে তিনি ছুটে চললেন উন্মত্তের মতো।

শীগগিরই জীর্ণ, কাতর ও মলিন একটি কেল্লার ধ্বংসস্তূপ দেখা গেলো চুড়ায়, নিচে ধারালো পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ চলে গেছে তার উদ্দেশে।

ওই যে–ওই যে আমার আত্মা! ক্ষিপ্তের মতো ছুটতে-ছুটতে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস।

আন্দেরনাৎ-এর কেল্লাটির ধ্বংসই কেবল তখন আছে। প্রচণ্ড স্থূলাকার স্তম্ভ উঠে গেছে কেল্লার উপর-নড়বোড়ে সেই স্তম্ভটা হাওয়ায় দুলছে কেবল এখন–যে-কোনো মুহূর্তে সমস্ত চুরমার করে কেল্লার ছাতে ভেঙে পড়ে যাবে। গভীরতর কোনো আর্তনাদ যেন কালো পাথরের সেই বিশাল স্তূপে মূর্তি পেয়েছে। কালো-কালো কতগুলি মস্ত হলঘর দাঁড়িয়ে আছে সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে–পাথর কেটে-কেটে খিলেন তৈরি হয়েছিলো একদা, এখন তাতে গর্ত গজিয়েছে অংসখ্য, কুণ্ডলী পাকিয়ে গোখরোরা শুয়ে আছে সেখানে।

জঞ্জাল ভরা এক পরিখার মুখে কেল্লায় যাবার গুপ্তদ্বার। কে যে এই কেল্লায়। থাকে, কেউ তা জানে না। নিশ্চয়ই কোনো আধা-দস্যু আধা-অভিজাত জার্মান ধনপতির

প্রমাদবীথিকা ছিলো এটা একদা–পরে কোনো দস্যুদল বা জাল টাকা নির্মাতারা এসে আশ্রয় নিয়েছিলো এখানে-শেষে তাদের এখানেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কিংবদন্তি বলে যে শীতের রাতে স্বয়ং শয়তান এসে তার ভয়ংকর নৃত্যসভা বসায় এই গিরিখাতে–এই ধ্বংসস্তূপের ছায়া যেখানে অতিকায়ভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠে সেই ভীষণ নাচে যোগ দেয়।

কিন্তু এই অলুক্ষুণে জনরব জাকারিয়ুসকে একটুও দমাতে পারলো না। গুপ্তদ্বারের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন তিনি–কেউ তাকে কোনো বাধা দিলো না বা নিষেধ করলো না। মস্ত একটা স্তব্ধ মলিন উঠোনে এসে পৌঁছুলেন তিনি–কেউ তাঁকে সেটা পেরিয়ে যেতে নিষেধ করলো না। সেই অধোগামী উঠোন পেরিয়ে লম্বা একটা বারান্দায় এসে পড়লেন জাকরিয়ুস। বড়ো-বড়ো থাম আর খিলেনগুলি যেন দিনের আলোকে নির্বাসন পাঠিয়েছে এখান থেকে। চিরন্তন আঁধারের মধ্যে হাওয়া যেন ভারি হয়ে আছে এখানে। জাকারিয়ুসকে কেউ কোনো বাধা দিলো না। তাঁর একটু পিছনেই আসছে জেরাঁদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা।

যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য হাত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাই বুঝি মাস্টার জাকারিয়ুসের মোটেই পথ ভুল হচ্ছে না; তিনি যেন নিশ্চিত করে জানেন তার পথ, আর তাই এখন ক্ষিপ্র প্রায়ে এগিয়ে যেতে পারছেন। পোকায় কাটা, ঘুণধরা একটা পুরোনো দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি; তাঁর প্রবল করাঘাতে দরজার পাল্লা ভেঙে পড়লো, আর মাথার উপরে পাখা ঝাঁপটে অদ্ভুত বৃত্ত এঁকে উড়তে লাগলো বাদুড় ও চামচিকে।

ঘরটা মস্ত-বিরাট একটা হলঘর আসলে : অন্য ঘরগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। খিলেনগুলিতে স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সাপ, কিম্ভূত ও বিকট সব প্রেতমূর্তি, আরো নানা অদ্ভুত অপজীব–বিশৃঙ্খল ও ভয়ংকরভাবে তারা ভিড় করে আছে দেয়ালে। লম্বা সরু কতগুলি ঘুলঘুলির মতো জানলা–পাল্লাগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় যেন শিউরে শিউরে উঠছে।

হলঘরটার মাঝখানে পৌঁছে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস। লোহার আংটা দিয়ে দেয়ালের গায়ে টাঙানো আছে সেই ঘড়িটা, যার উপর তার প্রাণ নির্ভর করছে। অতুলনীয় তাঁর এই কীর্তি : প্রাচীন কোনো রোমক মন্দিরের মতো তার গঠন, পেটা লোহার গায়ে ঠেশ দিয়ে আছে সে, ঠেশ দিয়ে আছে তার ভারি ঘণ্টাস্তম্ভ : আর যখন এখানে ঘণ্টা বেজে ওঠে তখন যেন তার ঢং ঢং আওয়াজে প্রার্থনাসভার গানের সুর বেজে ওঠে। এই তার পরমায়ু–এই ঘড়িটা। মন্দিরের দুয়ারের উপরে একটা গোলাপ বসানো, আর তারই মাঝখান থেকে বেরিয়েছে ঘড়ির দুটি কাটা, আর তারই পাপড়িগুলোর চারপাশে বারো ঘণ্টার বারোটি অঙ্ক বসানো–ঘণ্টা যখন বেজে ওঠে, মন্দিরের দুয়ার যেন খুলে যায় মন্ত্রবলে। দরজা আর গোলাপের মাঝখানে, স্কলাস্টিকা যেমন বলেছিলো সেই অনুযায়ী, অনুশসান ফুটে ওঠে তলিপিতে-দিনের বিভিন্ন সময়ে সর্বোবস্থায় আচরণীয় বিভিন্ন অনুশাসন ফুটে ওঠে। একদা সত্যিকার কোনো খ্রিষ্টানের মতো কোনো-এক ঐশী প্রেরণায় আশ্চর্য। এই ঘড়িটি বানিয়েছিলে মাস্টার জাকারিয়ুস, যার প্রতিটি জিনিশ ধর্মপুস্তকের সংহিতা মেনে তৈরি করা হয়েছিলো; প্রার্থনা, স্তব, বিনোদ, নীতিবাক্য, অনুশাসন–সর্বত্রই এক ধর্মীয় যাপন নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার ছাপ : এই ঘড়ির নির্দেশ অনুযায়ী কেউ যদি জীবনযাপন করে, তাহলে তার ত্রাণ অবশ্যম্ভাবী।

উল্লাসে মাস্টার জাকারিয়ুস যেন নেশাতুর হয়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি তিনি ঘড়িটা দখল করবার জন্য এগিয়ে গেলেন, আর এমনি সময়ে ঠিক যেন তাঁর পাশেই বিকট রোলে কে অট্টহাসি করে উঠলো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে, ধোঁয়া-ওঠা এক বাতির আলোয় জাকারিয়ুস দ্যাখেন জেনিভার সেই ভীষণ বামনটি!

তুমি? তুমি এখানে? চীৎকার করে উঠলেন জাকারিয়ুস।

ভয়ে জেরাঁদ যেন কুঁকড়ে গেলো। ওবেরের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সে।

আপনাকে শুভদিন জানাই, মাস্টার জাকারিয়ুস,শয়তানের মতো ভয়ংকর লোকটা বলে উঠলো।

কে? কে তুমি?

সেনর পিত্তোনাচ্চিয়ো–আপনার সেবার জন্য অধীন সর্বদাই প্রস্তুত। আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিতে এসেছেন? আমি যে বলেছিলুম, জেরাঁদের সঙ্গে কিছুতেই ওবেরের বিয়ে হবে না, তা আপনার মনে পড়েছে। তাহলে!

পিত্তোনাচ্চিয়োর দিকে সবেগে ছুটে গেলো ওবের–কিন্তু ছায়ার মতো সে সরে গেলো এক পাশে।

থামো, ওবের! জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন।

শুভরাত্রি, বলে পিত্তোনাচ্চিয়ো অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বাবা, চলো, এই জঘন্য জায়গাটা থেকে পালিয়ে যাই। কাতরভাবে অনুনয় করলো জেরাঁদ : বাবা!

কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর সে-ঘরে তখন নেই। ভাঙাচোরা বারান্দা দিয়ে তিনি তখন পিত্তোনাচ্চিয়োর ছায়ার পিছনে ছুটেছেন। স্কলাস্টিকা, জেরাঁদ আর ওবের সেই ভীষণ হলঘরে স্তম্ভিতের মতো হতবা দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা পাথরের আসনে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলো জেরাঁদ। স্কলাস্টিকা তার পাশে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলো; আর; ওবের দাঁড়িয়ে রইল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার বাগদত্তাকে। অন্ধকারের মধ্যে মরা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে; মাঝে-মাঝে কেবল বন্য নিশাচরদের আনাগোনায় শিউরে-শিউরে উঠছে স্তব্ধতা, আর সেই মরণ-ঘড়ি যখন ঢং ঢং করে বেজে উঠছে তখন সেই নীরবতা যেন ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দিনের আলো জেগে উঠতেই সেই ভগ্নস্তূপের চারপাশ ঘিরে ঘুরে-ঘুরে যে-অফুরন্ত সিঁড়ি চলে গেছে, তাতে পা দেবার সাহস পেলো তারা। দুঘণ্টা ধরে তারা ঘুরলো এই সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু কোনো জ্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে তাদের দেখা হলো না। শুধু দূর থেকে তাদের কাতর ডাকের উত্তরে বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। কখনো মনে হয় বুঝি জ্যান্ত কবর হলো তাদের, কারণ সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির তলায় একশো ফুট; আবার কখনো সিঁড়ি

তাদের যেখানে নিয়ে আসে, ক্ষুধিত গিরিচূড়া তার অনেক নিচে হিংস্রভাবে ওৎ পেতে আছে।

শেষকালে তারা হঠাৎ আবার সেই মস্ত হলঘরটায় এসে পৌঁছুলো– এইখানে ছটফট করে ওই কষ্টের রাতটা কাটিয়েছে তারা। ঘরটা এখন আর ফাঁকা নেই : মাস্টার জাকারিয়ুস আর পিত্তোনাচ্চিয়ো কথা বলছেন সেখানে একজন সোজা ও শক্ত দাঁড়িয়ে আছেন মড়ার মতো, আরেকজন শিকারী জন্তুর মতো, গুটি মেরে বসে আছে এক মারবেল পাথরের টেবিলে।

জেরাঁদকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এলেন মাস্টার জাকারিয়ুস, তারপর তার হাত ধরে পিত্তোনাচ্চিয়োর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, জেরা, তোমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো-এঁর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

জেরাদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিউরে উঠলো।

কখনো না, চেঁচিয়ে উঠলো ওবের, কারণ আপনার মেয়ে আমার বাগদত্তা।

কক্‌খনো না, জেরাঁদ যেন দূরাগত কোনো প্রতিধ্বনি।

হো-হো করে হেসে উঠলো পিত্তোনাচ্চিনেয়া।

তাহলে কি তুই চাস আমার মৃত্যু হোক!ভাঙা গলায় বৃদ্ধ বলে উঠলেন, ওই দ্যাখ, ওই যে ঘড়িটা, ওরই মধ্যে আমার প্রাণ বন্দী হয়ে আছে। যতগুলো ঘড়ি বানিয়েছিলুম, তার

মধ্যে এটাই কেবল এখনও অব্দি বিকল হয়নি। আর এই লোকটা কেবল বলছে যে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে দিলেই ঘড়িটা আপনার হয়ে যাবে।" আর-কোনোদিনও নাকি ঘড়িটায় দম দেবে না সে, এই সে স্থির করেছে। সে-ই এখন ঘড়িটার মালিক, তাই সে ইচ্ছে করলেই ভেঙে ফেলতে পারে এটা–ধ্বংসের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারে আমাকে। হায়, জেরাঁদ, শেষকালে তুইও আমাকে ত্যাগ করলি–তুইও আর ভালোবাসিস না আমাকে।

বাবা! যেন কোন মূর্ছা থেকে জেগে উঠলো জেরাঁদ।

তুই যদি একবার জানতিস কী ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে আমাকে, আমার আয়ুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি কত-কত দূরে। ভাঙা গলায় আবার শুরু করলেন জাকারিয়ুস। হয়তো কেউই আর ঘড়িটার যত্ন নেয় না আজকাল। হয়তো স্প্রিংগুলোয় মরচে ধরে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাবে কোনোদিন হয়তো চাকাগুলো জং ধরে হঠাৎ আটকে যাবে একদিন। কিন্তু একবার যদি আমি একে হাতে পাই তো আমি তার সেবা করতে পারি। দিন-রাত যত্নে অটুট রাখতে পারি তার কলকজা-কারণ কিছুতেই মরা উচিত নয় আমার। আমি জেনিভার মহান ঘড়িনির্মাতা...আমার মৃত্যু তো জগতের সর্বনাশেরই নামান্তর। দ্যাখ দ্যাখ, কেমন ধুকেধুকে এগুচ্ছে কাঁটাগুলো। দেখেছিস, এক্ষুনি পাঁচটার ঘণ্টা পড়বে। ওই শোন, ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাকিয়ে দ্যাখ, কোন অনুশাসন বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে।

ঢং-ঢং করে পাঁচটা বেজে উঠলো, আর তার আওয়াজ যেন এক বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি তুললো জেরাঁদের হৃদয়ে যার রেশ অনেকক্ষণ থেকে গেলো। তারপরে রক্তের মতো রাঙা অক্ষরে এই অনুশাসন ফুটে উঠলো ঘড়ির মধ্যে :

বিজ্ঞানতরুর ফল তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে।

স্তম্ভিতের মতো পরস্পরের দিকে তাকালো ওবের আর জেরাঁদ। কিন্তু কই, ক্যাথলিক ঘড়িনির্মাতার ধর্মীয় অনুশাসন তো এ নয়! নিশ্চয়ই শয়তানের নিশ্বাস পড়েছে এক উপর। কিন্তু জাকারিয়ুস তার দিকে দৃপাতও করলেন না।

শুনছিস, জেরাঁদ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তুই? বাঁচতেই হবে আমাকে, আরো বাঁচতে হবে। এই শোন, আমার নিঃশ্বেসের শব্দ-দ্যাখ, কেমন করে ধমনীয় মধ্যে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। না, তুই তোর বাবাকে মারতে পারসি না। যাতে আমি মৃত্যুহীন হয়ে উঠি, যাতে আমি অবিনশ্বর হই, যাতে ঈশ্বরের ক্ষমতা হাতে পাই, সেই জন্যে এই লোকটাকে বিয়ে করতেই হবে তোকে।

এই পাপবাক্য শুনে স্কলাস্টিকা সভয়ে তার বুকে ক্রুশ আঁকলো, আর উল্লসিত পিত্তোনাচ্চিয়ো অট্টরোলে হেসে উঠলো।

আর, একে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি, জেরাঁদ। দেখেছিস এর দিকে তাকিয়ে? দ্যাখ, এ আর কেউ নয়-মহাকাল! যদি একে বিয়ে করিস, তবে নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তোর জীবন। জেরাঁদ, আমি তোর জনক, আমার কাছ থেকেই তুই প্রাণ পেয়েছিস-তোর বাবাকে তুই সেই প্রাণ ফিরিয়ে দে।

জেরাঁদ, ফিশফিশ করে বলে উঠলো ওবের, তুমি আমার বাগদত্তা।

চেতনা হারিয়ে ফেলতে-ফেলতে বললো জেরাঁদ, কিন্তু তিনি যে আমার বাবা!

পিত্তোনোচ্চিয়ো, জেরাঁদ তোমারই! মাস্টার জাকারিয়ুস বললেন, এবার তোমার কথা রাখো, পিত্তোনাচ্চিয়ো।

এই যে ঘড়ির চাবি, ভীষণ লোকটা উত্তর দিলে।

কুণ্ডলী-খোলা সাপের মতো লম্বা চাবিটা যেন ছিনিয়ে নিলেন জাকারিয়ুস, দৌড়ে গেলেন তিনি ঘড়িটার কাছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ঘড়িটায় তিনি দম দিতে লাগলেন। স্নায়ুপীড়ন করে কাঁচ-ক্যাচ শব্দ করে উঠলো স্প্রিং। কেবল দমই দিয়ে যাচ্ছেন জাকারিয়ুস, চাবি ঘোরাচ্ছেন তো ঘোরাচ্ছেনই, মুহূর্তের জন্য থামাচ্ছেন না-মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা যেন তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততরভাবে চাবি ঘোরাতে লাগলেন তিনি, অদ্ভুত মোচড় দিচ্ছেন জোরে-জোরে, আর যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে সর্বাঙ্গ–শেষকালে অবসন্ন অবশ হয়ে পড়ে গেলেন তিনি নিচে।

ব্যস, এক শতাব্দী যাবে এবার, এত দম দিয়েছি। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

হল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো ওবের-তার মনে হচ্ছে যেন সে পাগল হয়ে গেছে। উন্মত্তের মতো ঘুরলো সে অনেকক্ষণ, তারপর কোনোরকমে এই জঘন্য কেল্লার গোলকধাঁধা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলো। খোলা হাওয়ায় এসে যেন বাঁচলো এবার।

তাড়াতাড়ি নোত্রদাম-দু সেক্স-এর মঠটায় ফিরে গেলো! এমন হতাশ ও মরিয়ার মতো সে অনুনয় করলে যে শেষকালে সেই যাজক তার সঙ্গে আরেনাৎ-এর কেল্লায় যেতে রাজি হলেন।

এই তীব্র মনস্তাপ ও যন্ত্রণায় জেরাঁদ যদি বিলাপ না-করে থাকে, তাহলে তার কারণই হলো এই যে তার অশ্রুর উৎস একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো।

এক মুহূর্তের জন্যও ওই হল ছেড়ে বেরোননি জাকারিয়ুস। বারে-বারে। দৌড়ে গিয়ে কান পেতে সেই পুরোনো ঘড়িটায় টিকটিক শব্দ শুনেছেন তিনি। আর এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠেছে ঘড়িতে, আর স্কলাস্টিকার সামনে কোনো অনন্ত বিভীষিকার মতো তার চকচকে ডায়ালে সংহিতা ফুটে উঠেছে :

মানুষকে ঈশ্বরের সমান হতে হবে।

এই পাপ অনুশাসন যে জাকারিয়ুসকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি তাই নয়, নেশাতুরের মতো চেখে চেখে সোল্লাসে পড়েছেন তিনি এই অনুশাসন, দম্ভে তার বুক ভরে গেছে, আর পিত্তোনাচ্চিয়ো তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে সহাস্যে।

ঠিক মধ্যরাতে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। জেরাঁদ তো প্রায় যেন নিশ্চেতন কোনো জীব–তার চোখ-কান সব যেন নিঃসাড় হয়ে গেছে–কিছুই তার কানে ঢোকে না–সব ক্ষমতা হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। আর এই ভারি, দমআটকানো স্তব্ধতা বেহে যাচ্ছে হয় জাকারিয়ুসের দম্ভোক্তিতে, নয়তো পিত্তোনাচ্চিয়োর খুকখুক হাস্যে।

এগারোটার ঘণ্টা পড়লো ঢং-ঢং। শিউরে উঠে মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে পড়লেন অনুশাসনটি :

বিজ্ঞানের ক্রীতদাস হয়ে পড়তে হবে মানুষকে : স্বজন, পরিজন, বন্ধু–সকলকে উৎসর্গ করতে হবে তার কাছে।

ঠিক? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, জগতে বিজ্ঞান ছাড়া আর-কিছুই সত্য নয়।

সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে কাটাগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, আর দোলকটি আরো তীব্র ও ক্ষিপ্রভাবে দুলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক, আর একটানা কেবল শব্দ হচ্ছে টিক-টিক-টিক।

কথা বলার কোনো ক্ষমতাই আর নেই জাকারিয়ুসের। পড়ে গেছেন তিনি মেঝেয়, শুষ্ক হয়ে গেছে যেন তার সর্বাঙ্গ, একেবারেই যেন আদ্রতাহীন-আর একটা ঘড়ঘড়ে ভাঙা গলায় তার বুক দিয়ে কেবল এই কথাগুলি বেরিয়ে এলো : জীবন...বিজ্ঞান?

আরো দুটি নতুন দর্শক এসে উপস্থিত হলো : ওবের আর সেই গিঞ্জের যাজক। জাকারিয়ুস মেঝেয় পড়ে আছেন লম্বালম্বি : তার পাশে বসে অবিরাম প্রার্থনা করে চলেছে জেরাঁদ–সে যেন আর বেঁচে নেই, এমনই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ঘণ্টা বাজার আগে যে শুষ্ক কর্কশ আওয়াজ জেগে ওঠে, হঠাৎ অতিকায়ভাবে সেই শব্দটা প্রতিধ্বনিত হলো চারদিকে।

লাফিয়ে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস!

মধ্যরাত্রি! চেঁচিয়ে বলে উঠলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ যাজকটি সেই পুরোনো ঘড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—

এবং মধ্যরাতের ঘন্টা আর বাজলো না।

অপার্থিব এক যন্ত্রণায় আর্ত চীৎকার করে উঠলেন জাকারিয়ুস; বুঝি তার প্রতিধ্বনি তৎক্ষণাৎ শোনা গেলো নরকের দিগন্ত থেকে দিগন্তে; আর তিনি তাকিয়ে দেখলেন ঘড়ির ডায়ালে শেষ অনুশাসন ফুটে উঠলো :

ঈশ্বরের সমান হয়ে ওঠবার চেষ্টা যে করবে, চিরকালের জন্য তাকে রসাতলে যেতে হবে।

একটা যেন বাজ ফেটে পড়লো, এমনি শব্দ করে ফেটে গেলো সেই পুরোনো ঘড়ি–আর ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো স্প্রিংটা, সহস্রবাঁকা ও পেঁচিয়ে-যাওয়া তারটি অদ্ভুতভাবে এঁকে-বেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেলো কোনো অতিকায় সাপের কুণ্ডলীর মতো! বিধ্বস্ত সেই মানুষটি দৌড়ে গেলেন তার কাছে, ব্যর্থ চেষ্টা করলেন সেটা কুড়িয়ে নেবার, আর বারেবারে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন : আত্মা-আমার আত্মা

জ্যান্ত হয়ে উঠলো যেন সেই তারের কুণ্ডলী : লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলো মেঝেয়, একবার এপাশে, একবার ওপাশে, আর তিনি কিছুতেই তার নাগাল পেলেন না।

শেষকালে পিত্তোনাচ্চিয়ো সেটা কুড়িয়ে নিলে, তারপর ভীষণ এক পাপবাক্য উচ্চারণ করে যেন মাটি ভেদ করে কোনো অতল গহ্বরে ঢুকে পড়লো।

চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন মাস্টার জাকারিয়ুস। তার দেহে আর প্রাণ নেই।

আন্দোরনাৎ-এর গিরিচূড়াতেই সমাহিত করা হয়েছিলো বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে।

তারপর ওবের আর জেরাঁদ ফিরে এসেছিলো জেনিভায়। ঈশ্বর তাদের দীর্ঘজীবন দিয়েছিলেন : আর যতদিন তারা বেঁচেছিলো এই দিগভ্রান্ত বিজ্ঞানসাধকের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করাটা তারা এর পরে তাদের নিত্যকর্মে পরিণত করেছিলো।